দ্বাদশ সূর্য্য

শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দেব-সাহিত্য-কুটীর :*: ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

সূচীপত্র

রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে তিনি জননীর মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন।

এক

উনবিংশ-শতাব্দীতে যখন বাংলাদেশ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং তাহার আচার-ব্যবহারের মোহে নিজের ঐতিহ্য এবং ধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল, যখন য়ুরোপের নব্য-বিজ্ঞান ভারতে সন্দেহ-বাদের সৌধ গড়িয়া তুলিতেছিল, সেই সময় বাংলাদেশের এক নামহীন গণ্ডগ্রামে, এক অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্রাহ্মণ তাঁহার অলোকসামান্য জীবন ও সাধনা দ্বারা নিশ্চিত আত্মিক অপমৃত্যুর হাত হইতে এই জাতিকে রক্ষা করিয়া যান এবং যতই দিন যাইতেছে ততই একশ্রেণীর মানুষের মনে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মগ্রহণ করিতেছে যে, শুধু বাংলা বা ভারতের কথা নয়, সেই অপরূপ লোকটীর জীবন-সাধনার মধ্যে বর্ত্তমান যুগের বেদনা-ব্যাধি-ক্লিষ্ট মানবের অমৃত-সন্ধান রহিয়াছে। সেই অপরূপ ব্যক্তিটী আজ জগতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নামে খ্যাত।

এই ভেদক্লিষ্ট, শত মত ও পথে বিক্ষিপ্ত মানুষের ধর্ম্ম-জীবনের নানা আপাত বৈষম্য ও দ্বন্দ্বের মধ্যে, তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে সর্ব্ব পথ ধরিয়া এবং সর্ব্ব মত আশ্রয় করিয়া এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান যে, বিরোধ কোথাও নাই। যত মত, যত পথ, এবং প্রত্যেক পথের শেষে, সেই পথের প্রান্তে মানব যাঁহাকে যুগে যুগে কামনা করিয়া আসিয়াছে, তিনিই দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জীবনে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যেক ধর্ম্ম-মতের বিশেষ বিশেষ অনুশাসন অনুযায়ী সাধনা করেন এবং প্রত্যেক ভাবে সাধনা করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। এই অবিশ্বাসী যুগে যখন দিকে দিকে মানুষের চিরন্তন আদর্শের পর্ব্বত-চূড়া সব মনে হইতেছে বুঝি ভাঙ্গিয়া সমতল হইয়া গেল, তখন একমাত্র এই মহাপুরুষের জীবন সমস্ত অবিশ্বাস ও সন্দেহের জীবন্ত প্রতিবাদ স্বরূপ আমাদের কাণে কাণে এই আশ্বাস আনিয়া দিয়াছে, অন্তরের ধ্রুবলোকে মানুষের ভগবানের আসনে ভগবান তেমনি বিরাজ করিতেছেন। তাই সেদিন বাংলার সেই নামহীন গণ্ডগ্রামে, সেই অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের একটু স্পর্শ পাইবার জন্য, নানা জাতির, নানা ধর্ম্মের ও ধর্ম্মমতের লোক পিপাসার্ত্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছিল, এবং তাঁহাদের পরমসৌভাগ্য যে তাহারা এই মানব-নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাঁহার অমৃত-স্পর্শ লাভ করিয়াছিল।

গ্রামের পাঠশালায় অতি সামান্য প্রাথমিক লেখাপড়া তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিদ্যার পুঁজি তাঁহার ছিল মাত্র ঐটুকু সম্বল, কিন্তু যেদিন তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন সেদিন সর্ব্ব-শাস্ত্রের, সর্ব্ব-জ্ঞানের মূলসূত্র তাঁহার চিত্তশতদলে প্রভাত-রবির আলোর মতন

আপনা হইতে আসিয়া পড়ে এবং অতি সাধারণ ভাষায়, তিনি সেই সব বাণী প্রকাশ করিতেন, যাহা তাঁহার একান্ত নিজস্ব। সাধনার দ্বারা তাঁহার দেহ ও মনের এমনই শুদ্ধি সাধিত হইয়াছিল যে, নিদ্রিত অবস্থাতেও কোন অশুচি জিনিষ তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তিনি বিষ-জ্বালা অনুভব করিতেন। এই সর্ব্বস্বত্যাগী মহাপুরুষ সর্ব্ব-লোভ, মোহ ও কাম হইতে এই ভাবে নিজেকে পরিশুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন যে, টাকার স্পর্শ পর্য্যন্ত তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর এই সাধারণ মানুষের জন্যই তিনি তাঁহার অমৃত-বাণী রাখিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ সময় তিনি গল্প বলিয়া, উপকথা বলিয়া, সাধারণ লোককে ধর্ম্মের এবং জীবনের সব গূঢ় কথা বুঝাইতেন, উপদেশ দিতেন। এই অসংখ্য সাধারণ মানুষের মধ্য হইতে তিনি একটী লোককে নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার অন্তরের অগ্নি-স্পর্শ দিয়া যান, সেই একটুকু অগ্নিস্পর্শ জগতে বিবেকানন্দরূপে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। রামকৃষ্ণদেবের নামের সঙ্গে তাই তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দের নাম ও সাধনা এই সন্দেহ-আকুল যুগে, এক নূতন বিশ্বাসের অমৃত-ধারা বহন করিয়া চলিয়াছে।

দুই

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামের পশ্চিম দিকে একটী ছোট্ট খাল, সেই খালের ধারে একটী আমবাগান, সেই আমবাগানে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করিতেছে—

কিছুদিন আগে গ্রামে কৃষ্ণযাত্রা হইয়া গিয়াছে, গদাধর নামে একটী ছোট্ট ছেলে সেই যাত্রায় রাধাকৃষ্ণের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিল অবিকল তাহাই অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া বলিয়া চলিয়াছিল, অন্য বালকেরা বিস্ময়ে ও আনন্দে তাহাই শুনিতেছিল···

এই হইল তাহাদের খেলা।

হঠাৎ কৃষ্ণ-কথা বলিতে বলিতে বালক গদাধর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল। অন্য বালকেরা ভয়-বিহ্বল হইয়া গেল। কেহ খালে গিয়া কাপড় ভিজাইয়া জল লইয়া আসিয়া বালকের চোখে মুখে দিতে লাগিল, কেহ বা আমের ডাল ভাঙ্গিয়া বালককে বাতাস করিতে লাগিল। এইভাবে কিছুক্ষণ সেবার পর বালক গদাধরের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

কে এই বালক গদাধর ?

সেই গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামে এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বালক গদাধর তাঁহারই পুত্র। ক্ষুদিরামের আর দুই পুত্র ছিল, রামকুমার ও রামেশ্বর। বালক গদাধরকে লইয়া তাঁহাদের বিশেষ ভাবনা ছিল। পড়াশোনায় বালকের তেমন মন ছিল না। অন্য কোন খেলাধূলাও বালক ভালবাসিত না। গ্রামের যেখানে যাত্রা

বা কথকতা হইত বালক সেখানে ঠিক উপস্থিত আছে, একমনে সেই সব শুনিত এবং বালকের এমন অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল যে, যাহা শুনিত ঠিক তাহাই বলিয়া যাইতে পারিত। এইভাবে শুনিয়া শুনিয়া বালকের রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের বহু কাহিনী জানা হইয়া গিয়াছিল। সমবয়সী ছেলেদের লইয়া গদাধর সেই সব যাত্রার পুনরাভিনয় করিয়া বেড়াইত। গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরাও বালকের মধুর কণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া সেই সব কথা ও গান আনন্দ সহকারে শুনিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে ক্ষুদিরাম অল্প বয়সেই সংসারকে অনাথ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। তখন গদাধরের মাত্র সাত বৎসর বয়স। গদাধরের ভাল নাম ছিল রামকৃষ্ণ।

পিতার মৃত্যুর পর সংসারে বিশেষভাবে অভাব অনটন দেখা দিল। আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া টোল খুলিয়া বসিলেন। রামকৃষ্ণ গ্রামে রহিয়া গেলেন। তাঁহার পড়াশোনা কিন্তু হইল না। তখন রামকুমার তাঁহাকে কলিকাতায় তাঁহার নিকট আনিয়া রাখিলেন। রামকৃষ্ণ টোলের ছাত্রদের রান্নাবাড়া, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে জ্যেষ্ঠের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

সেই সময় কলিকাতা শহরে এক পুণ্যবতী রমণী নিজের প্রচুর অর্থের সদ্ব্যয় করিবার জন্য এবং সেই সঙ্গে তাঁহার অন্তরের ধর্ম্মপিপাসা মিটাইবার জন্য কলিকাতা হইতে কিছু দূরে গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরের গণ্ডগ্রামে এক ঠাকুর-বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই নারীর নাম রাণী রাসমণি। তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন সেই ঠাকুর বাড়ীতে

বিশ্বজননীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই বিগ্রহের নিত্য প্রসাদ হইতে সাধু-সজ্জন ও দীন আতুরদের সেবা করিবেন। কিন্তু এই সংকল্প লইয়া যখন তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের দ্বারস্থ হইলেন, তখন একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া তিনি শুনিলেন যে, যেহেতু তিনি জাতিতে কৈবর্ত্ত, তাঁহার বিগ্রহ পূজায় কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ তিনি পাইবেন না এবং কৈবর্ত্তের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের অন্নভোগও হইতে পারে না। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মুখে এই কঠোর অনুশাসন শুনিয়া রাণী রাসমণির চিত্ত দুঃখে, বেদনায় ও ব্যর্থতায় কাঁদিয়া উঠিল। এই কাহিনী রামকুমারের কর্ণগোচর হইলে, রামকুমার বিস্মিত হইয়া গেলেন। মানুষের ধর্ম্মাচরণে শাস্ত্র কি কখনো এইরূপ কঠোর অনুশাসনের অচলায়তন গড়িয়া দিতে পারে? নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে শাস্ত্রের কোন না কোন বিধান আছে। এবং সত্য সত্যই তিনি বিধান খুঁজিয়া পাইলেন···রাণী যদি গুরুর নামে তাঁহার ঠাকুরবাড়ী উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। রামকুমারের এই বিধানের কথা শুনিয়া রাণীর অন্তর আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং রামকুমারের ব্যবস্থা অনুযায়ীই তিনি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাড়ীতে জগজ্জননীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাইলেন। বিগ্রহের নাম হইল ভবতারিণী। যেদিন মন্দিরে ভবতারিণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিন গ্রাম্য-ব্রাহ্মণ-যুবক রামকৃষ্ণের সহজাত সংস্কারে জ্যেষ্ঠের সেই আচরণ ভাল লাগে নাই, তাই সেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাড়ীতে জলগ্রহণ করেন নাই, বাজার হইতে মুড়ি-মুড়কী কিনিয়া খাইয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন, সেদিন ছিল স্নানযাত্রা, ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে, যেদিন বাঙালী-

ঘরের সেই দানশীলা নারীটি গঙ্গার তীরে বিশ্বজননীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাইলেন, সেদিন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ভাবজীবনের সবচেয়ে বড় স্মরণীয় লগ্ন।

রামকুমার পূজারীরূপে ভবতারিণীর পূজা করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে শুধু আসেন যান। কিন্তু তাঁহার সরল অমায়িক গ্রাম্য ব্যবহারে সকলেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং সকলের বার বার বিশেষ অনুরোধে তিনি ভবতারিণীর বেশকারের কাজ লইলেন। একদিন যে গ্রাম্য যুবক ব্রাহ্মণত্বের অভিমানে সেই মন্দির হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত চেতনা সেই বিগ্রহকে ঘিরিয়া ঘুরিতে লাগিল। বেশকারের কাজ হইতে কালক্রমে তাঁহার উপর ভবতারিণীর সেবার ভার পড়িল। সকলেই লক্ষ্য করিল, ধীরে ধীরে সেই লোকটি কেমন যেন সকলের নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছে ···সারা দিন সারা রাত্রি সে শুধু সেই মন্দিরকে বেড়িয়া সেই মূর্ত্তিকেই লইয়া থাকে।

সেই মূর্ত্তির সেবা করিতে করিতে কখন লোকচক্ষুর অন্তরালে সেই নিরক্ষর গ্রাম্য-যুবকের মনে, বিশ্বের যিনি জননী, তিনি সাক্ষাৎভাবে দর্শন দিলেন। কেহ এ সংবাদ জগতে রাখিত না। বাহির হইতে শুধু দেখা গেল, রামকৃষ্ণের কথাবার্ত্তা, ভাব-হাব যেন সমস্ত বদলাইয়া গেল। সারাদিন একমনে মালা গাঁথিয়া কত যত্নে সেই মূর্ত্তির গলায় দিতেন, কখনো বা একদৃষ্টিতে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিতেন, দুই গণ্ড দিয়া অশ্রুধারা বহিয়া চলিত···ক্রমশঃ ক্রমশঃ রামকৃষ্ণের বাহ্য-জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া গেল, নিশিদিন

সেই মূর্ত্তির ধ্যানে, সেবায় তিনি তন্ময় হইয়া থাকিতেন। ছেলে যেমন মার কাছে আবদার করে, তেমনি ভবতারিণীর নিকট তিনি আবদার করিতেন, নিশিদিন তাঁহার সহিত কথা বলিতেন, কখনো তাঁহার জন্য প্রস্তুত খাদ্য নিজেই খাইয়া বসিতেন, কখনো তাঁহার পূজার ফুল, ফুলের মালা, তাহার গলায় দিয়া আবার তাঁহার গলা হইতে নিজে পরিতেন। লোকে স্থির করিল যে রামকৃষ্ণ উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ এরূপ সব লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল যে, রামকৃষ্ণ ক্ষণে-ক্ষণে জ্ঞান হারাইতে লাগিলেন। যে-বিশ্বজননীর চকিত আবির্ভাব তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে সারাক্ষণ দেখিবার জন্য, তাঁহার চিত্ত মাতৃ-হারা শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল। মা, মা, বলিতে বলিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া গঙ্গার তীরে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেন, সেদিন রামকৃষ্ণের সেই অপরূপ মাতৃ-বিরহ যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন। সেই কাতর আহ্বানের ফলে বিশ্বজননী আর দূরে সরিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি জননীর মূর্ত্তিতে সাক্ষাৎভাবে তাঁহাকে দর্শন দেন।

অন্তরে তাঁহার আবির্ভাবকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য তিনি দুঃসাধ্য সাধনায় আত্মগাহন করিলেন। জগতে যত প্রচলিত ধর্ম্মমত এবং ব্যবস্থা আছে, তিনি একে একে সেই সমস্ত মত ও পথ অনুযায়ী সাধনা করিলেন এবং প্রত্যেক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, এই সংশয়-বিক্ষুব্ধ জগতে এক মহাসত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, মুক্তির পথ এক নয়, শত দিক হইতে শত পথ চলিয়া গিয়াছে, সরল বিশ্বাসে যে পথ দিয়াই যাও না কেন, সেই পথের শেষে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান আছেন।

এই বহু পুরাতন সত্য রামকৃষ্ণ তাঁহার নিজের জীবন-সাধনা দ্বারা এই সংশয়-বিক্ষুব্ধ বৈজ্ঞানিক যুগে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। তাঁহার সাধনার শেষ-সময়ে তাঁহার সহিত ভারত-খ্যাত সাধক তোতাপুরী গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। তিনিই প্রথম রামকৃষ্ণের মধ্যে পরম-হংসের সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পান।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, তাঁহার দর্শনের জন্য, তাঁহার উপদেশের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন। সেই অসংখ্য ভক্ত-যাত্রীর মধ্যে একদা একটা ছেলে আসিল। তাহার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জীবনের উন্মেষ-মুখে একটা চিন্তা এবং একটা প্রশ্ন তাহার সমস্ত দেহমন-আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সে প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য জীবনের সকল-সুখ-সাধ সে বিসর্জ্জন দিয়াছে, সমস্ত বৈষয়িক কামনা ত্যাগ করিয়াছে, যেখানে শোনে কোন সাধু-সন্ন্যাসী আছে, সেইখানেই তাহার ব্যাকুল অন্তরের সেই প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হয়…উত্তর যে সে একেবারে পায় না, তাহা নয়, কিন্তু সে-উত্তরে তাহার অন্তর সায় দেয় না…সে প্রশ্ন হইল, ঈশ্বরকে কি সত্য প্রত্যক্ষদর্শন করা যায়? যদি দর্শন করা যায়, কে দেখেছে? দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ সেই আপন-ভোলা গেঁয়ো সাধুটিকে দেখিলেন, সাধুটিও তাঁহাকে দেখিলেন…সেই এক প্রশ্ন… কিন্তু এবার আর নরেন্দ্রকে ফিরিয়া যাইতে হইল না…জীবনে তিনি সেই প্রথম মানব-কণ্ঠে অতি স্পষ্টভাবে শুনিলেন একজন বলিতেছে

যে, হাঁ, তিনি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যেমন ভাবে তাঁহার সম্মুখস্থ সমস্ত জিনিসকে তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অন্তরের সমস্ত দ্বিধা কাটিয়া গেল...রামকৃষ্ণের স্পর্শে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে মহাচৈতন্য জাগিয়া উঠিল...যখন রামকৃষ্ণ এই জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন তখন নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ নামে পরিচিত...গুরুর নামে তাঁহারা জনকয়েক সংসারত্যাগী অর্থহীন সন্ন্যাসী সেদিন যে মহাসংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ তাহা ভারতের ভাব-জীবনের অক্ষয়-বটে পরিণত হইয়াছে—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও ভাব-ধারা আজ এই বেদনাক্লিষ্ট যুগের নিকট বাংলার অমৃত-অর্ঘ্য।
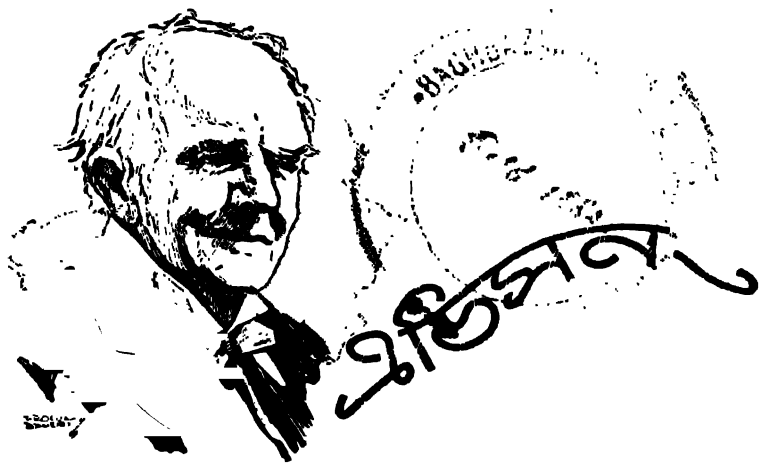
টমাস আল্‌ভা এডিসন সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া উল্লিখিত হন। তিনি ১৮৪৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমেরিকার মিলানের ওহিয়ো সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে শত সহস্র বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ও বিচিত্র আবিষ্কারের দ্বারা মানবের সুখ ও সুবিধা এত বাড়াইয়া দিয়াছিলেন যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইত, যাহা করিবার তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞানের নূতন কোনও বিভাগে নূতন কিছু করিবার অবকাশ তাঁহারা রাখিয়া যান নাই। অলস কর্ম্মবিমুখ যাহারা তাহারা সহজেই বলিতে পারিত, করিবার আর আছে কি? যে দিকেই মাথা খাটাইতে যাই, দেখি, পূর্ব্বগামীরা কাজ সারিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কিছু কম আবিষ্কার করিলে চেষ্টা করিয়া দেখিতাম। কিন্তু এই বিপুলা পৃথিবী, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য মহাদেশ শুধু এই ধরণের আরামপ্রিয়

নিরুদ্যম ব্যক্তিদের অধিষ্ঠানভূমি নয়, বিপুল উদ্যমশালী মহাপুরুষেরা জন্মিয়াছেন এবং সকল অসুবিধা সত্ত্বেও নিরলস চেষ্টার দ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবীতে নূতন কিছু করিবার অবকাশ সব সময়েই আছে, আজও আছে এবং কালও থাকিবে। এডিসন গত শতাব্দীতে এই উদ্যোগী পুরুষদের অগ্রণী ছিলেন বলিয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

পূর্ব্বগামীদের সকল কীর্ত্তি সত্ত্বেও গত শতাব্দীতে কত নূতন আবিষ্কার হইয়াছে শুনিলে বিস্ময়াপ্লুত হইতে হয় এবং এই বিশ্বাস জন্মে যে পরিষ্কার মাথা এবং সুস্থ কর্ম্মপ্রেরণা থাকিলে মানুষের উদ্ভাবনী-শক্তি বন্ধ্যা থাকিতে পারে না। একা এডিসন কি অঘটন ঘটাইয়া গিয়াছেন ইউনাইটেড স্টেট্স পেটেণ্ট অফিসে তাহার পরিচয় আছে। ১৮৭৯ সালে যখন তাঁহার বয়স মাত্র ২২ বৎসর তখন হইতে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তিনি পনের শতেরও অধিক আবিষ্কারের পেটেণ্টের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন; আরও ১২০টি দপ্তরে তাহার দেড় হাজারেরও অধিক আবিষ্কারের উল্লেখ আছে। বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট হইতেও তিনি মোট ১২৩৯টি আবিষ্কারের পেটেণ্ট করাইয়াছেন। এই গুলিতেই তাঁহার উদ্ভাবনীপ্রতিভা সম্পূর্ণ নহে, ভবিষ্যৎ আবিষ্কর্ত্তাদের সুবিধার জন্য তিনি অসংখ্য নূতন আবিষ্কারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার সাধারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়াও যুদ্ধকার্য্যে স্বদেশকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল কাজ করিয়াছেন আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট সেজন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ

থাকিবে। এগুলি বৈজ্ঞানিকের দেশপ্রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দুই বৎসরের অধিক কাল তিনি নিজ গবেষণাগারের ভার তাঁহার কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত করিয়া দেশের সেবায় মাতিয়াছিলেন। আমেরিকান নৌবিভাগ তখন তাঁহার নিকট ৪৫টি বিভিন্ন সমস্যা উপস্থাপিত করে, তিনি প্রভূত পরিশ্রম সহকারে সবগুলিরই সমাধান করিয়া দেন। ডুবো জাহাজ (সাবমেরিন) সম্বন্ধে এই সময়েই তিনি অনেক নূতন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কার্বলিক এসিড, এনিলিন অয়েল, এনিলিন সল্ট, বেনজল, প্যারাফেনিলিনডাইএমিন প্রভৃতি যুদ্ধকার্যে নিত্য ব্যবহৃত যে সকল দ্রব্য পূর্বে ইয়োরোপ হইতে আনাইতে হইত, স্বদেশেই তিনি সেগুলি উৎপাদনের সুব্যবস্থা করিয়া দেন।

এডিসনের আবিষ্কারগুলি মানুষের ব্যবহারিক জীবনে যে ভাবে কাজে লাগিতেছে, তাহা বিবেচনা করিলে এই অসাধারণ মানুষটির অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। এই আবিষ্কারগুলির সাহায্যেই মানবীয় সভ্যতার উৎকর্ষসাধনকারী বহু চারুশিল্পকলা ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই গুলিতে বর্তমানে ৩৫০০ লক্ষের অধিক টাকা খাটিতেছে। এই সকল ব্যবসায়ের বাৎসরিক মুনাফা ৪২৫ লক্ষ টাকারও অধিক ; এবং ন্যূনাধিক ১০ লক্ষ লোক এই সকল ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। সবগুলিই যে এডিসনের নিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছে তাহা নহে, প্রত্যেকটির মূলে যে তিনি আছেন, মূল সূত্রগুলি যে তাঁহার মস্তিষ্কপ্রসূত, তাঁহার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ না পাইলে যে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিত না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এডিসন দীর্ঘজীবী, সুস্থ ও সবল পরিবারের সন্তান। কিন্তু শৈশবাবস্থায় তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তিনি খুব শান্ত প্রকৃতির হইলেও অত্যন্ত জিজ্ঞাসু ছিলেন—প্রশ্নে প্রশ্নে পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের অস্থির করিয়া তুলিতেন। পাঁচ ছয় বৎসর বয়সেই তাহার চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহার আগ্রহ লক্ষিত হইত। দুর্ব্বল ছিলেন বলিয়া বাল্যে তাহাকে বিদ্যালয়ে দিয়া ছাড়াইয়া আনা হয়; তাহার মাতা স্বয়ং তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তোলেন।

দশ এগার বৎসর বয়সে রসায়ন-শাস্ত্রে তাহার অত্যন্ত অনুরাগ দেখা যায়। তিনি কেমিষ্টি সম্পর্কীয় বহু পুস্তক সংগ্রহ করেন এবং বাড়ীর একটি ছোট কুঠরীকে তাহার গবেষণাগার করিতে দিবার জন্য মাতার অনুমতি লন। স্থানীয় ঔষধালয়ে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন সেইগুলির সাহায্যেই তিনি পরীক্ষা চালাইতেন। এইভাবে এই ক্ষুদ্র কুঠরীতে ছোট বড় আকারের প্রায় দুই-শত বোতল ও শিশি সজ্জিত ছিল—পাছে কেহ সেগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করে এই জন্য প্রত্যেকটির গায়ে 'বিষ' এই লেবেল লাগাইয়া রাখিতেন। সেই বয়সেই তাহাকে বলিতে শোনা যাইত যে নিজে পরীক্ষা করিয়া না দেখিয়া তিনি কোনও বইয়ের কোনও কথাই বিশ্বাস করিবেন না।

বার তের বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবে চলিয়া তিনি যখন দেখিলেন যে, হাত-খরচার টাকায় মালমশলার খরচ আর কুলাইতেছে না, তখন তিনি রেলগাড়ীতে খবরের কাগজ বেচিয়া পয়সা উপার্জ্জনের জন্য

পিতামাতার অনুমতি লইলেন। পোর্ট হারণ হইতে ডেট্রয়েট পর্য্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রেলওয়ের ট্রেণে ট্রেণে তিনি সংবাদপত্র ও অন্যান্য খুচরা জিনিষ বিক্রয় করিতে সুরু করিলেন। তাঁহার জিনিষের ষ্টক রাখিবার জন্য মালগাড়ীর একটি কামরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তিনি সেখানেই বাড়ী হইতে তাঁহার গবেষণাগার তুলিয়া আনেন এবং অবসর সময়ে পরীক্ষা করিতে থাকেন। এই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে একটা পুরাতন মুদ্রাযন্ত্র ও কিছু টাইপ কিনিয়া তিনি একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিয়া ট্রেণে বেচিতে সুরু করেন। এই সাপ্তাহিকের নাম দেওয়া হয় উইক্‌লি হেরাল্ড এবং এডিসন হন এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, সম্পাদক, কম্পোজিটার, প্রেসম্যান ও ডিষ্ট্রিবিউটার। ঐ পত্রিকায় সাধারণত স্থানীয় বাজার-দর ও রেলের খবরাখবর থাকিত এবং এক সময় উহার নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকসংখ্যা হইয়াছিল ৪০০। যতদূর জানা যায়, চলতি ট্রেণে ছাপা ইহাই প্রথম সংবাদপত্র ও এডিসনই সম্ভবত ছাপা সংবাদ-পত্রের তরুণতম সম্পাদক।

এই ভাবে এডিসন দুই তিন বৎসর কাগজ ফিরি ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা চালাইতে থাকেন কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় একদিন ফস্‌ফরাস সমেত একটি শিশি গাড়ীর মেঝেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায় ও কামরায় আগুন ধরে। ট্রেণের কণ্ডাক্টার শিশি বোতল সমেত বালককে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেয় ও তাঁহার কর্ণমূলে এমন ঘুষি মারে যে, সেই দিন হইতেই তাঁহার কানের দোষ ঘটে। ইহার ফলেই তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে বধির হইয়া যান।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে এডিসন এক ষ্টেশনের কর্ম্মচারীর কন্যাকে রেল লাইনের উপর সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করেন। কৃতজ্ঞ পিতা পরিবর্ত্তে এডিসনকে টেলিগ্রাফী শিখাইতে রাজী হন। এডিসন এই সুযোগ না ছাড়িয়া যত্নসহকারে রেলওয়ে টেলিগ্রাফী শিখিতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাসায়নিক গবেষণাও যথারীতি করিয়া যান। 'খবরের কাগজের ছোকরা'র জীবন এইখানেই তাঁহার শেষ হয় এবং পনের বৎসর বয়সে এক স্টেশনে টেলিগ্রাফ অপারেটার নিযুক্ত হন।

নূতন কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ উৎসাহ ছিল। ইউনাইটেড স্টেট্‌সের বিভিন্ন স্থানে তিনি টেলিগ্রাফীর কাজ করিয়া দক্ষতা লাভ করেন। অল্প ঘুমাইলেই তাঁহার চলিত বলিয়া তিনি দৈনিক প্রায় ২০ ঘণ্টা করিয়া খাটিতেন। রাসায়নিক পরীক্ষা ছাড়াও তাড়িৎ-বিদ্যা ও টেলিগ্রাফী বিষয়ে তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। নিজের 'গতি' (speed) বাড়াইবার জন্য তিনি দিনে অফিসের কাজ করিয়াও রাত্রে প্রেস অপারেটারের কাজ করিতেন। এইরূপে এই কার্য্যে তিনি এমন দক্ষতা লাভ করিলেন যে তাঁহার সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ টেলিগ্রাফার বলিয়া খ্যাত হইলেন এবং খ্যাতি অনুযায়ী বেতনও পাইতে লাগিলেন।

তিনি পাঁচ বৎসর এই ভাবে কাজ করেন। এই সময়ে ছোটখাটো কয়েকটি আবিষ্কার ছাড়া তিনি টেলিগ্রাফীর দ্বিত্ব প্রণালী অর্থাৎ একই তারের সাহায্যে দুই দিক হইতে দুই সংবাদ একসঙ্গে প্রেরণ করার প্রণালী আবিষ্কার করিয়া পেটেণ্ট বিক্রয়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু নানা

কারণে কৃতকার্য্য হন নাই। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বোষ্টন সহরে 'ষ্টকটিকার' নামক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া অপর কয়েকজনের চাঁদার সাহায্যে সেটিকে ব্যবসায়ের সামগ্রী করিয়া তোলেন। আরও কিছুদিন বাহিরে বাহিরে কাজ করিয়া তিনি অবশেষে নিউইয়র্ক সহরে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য যাত্রা করেন।

১৮৬৯ সালের এক শুভ প্রভাতে এডিসন নৌকাযোগে নিউইয়র্ক সহরে উপস্থিত হন। তিনি যখন তীরে অবতরণ করেন তখন তাঁহার কাছে প্রাতরাশের উপযুক্ত অর্থও ছিল না। এই সাংঘাতিক অবস্থায় সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে থাকেন। কোন্ চা ভাল, চাখিয়া দেখিবার জন্য এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে টি-টেষ্টার বলে। ইহাদেরই একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া এক কাপ চা খাইতে দেন। সন্ধ্যা নাগাদ একজন টেলিগ্রাফ অপারেটারের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার কাছ হইতে এক ডলার ধার লইয়া তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। সন্ধ্যায় তিনি ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানীর একটি চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করেন ও যতদিন না চাকুরী পান ততদিন গোল্ড ইণ্ডিকেটার কোম্পানীর ব্যাটারী ঘরে রাত্রিবাস করিবার অনুমতি পান।

দরখাস্তের জবাবের আশায় থাকার সময় দিনের বেলায় তিনি গোল্ড ইণ্ডিকেটার কোম্পানীর অপারেটিং ঘরে কাটাইতেন। তৃতীয় দিনে একটা দুর্ঘটনার ফলে সেণ্ট্রাল ট্রান্সমিটিং মেশিনটি হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের খরিদ্দারদের প্রায় তিনশত মেশিনও বন্ধ থাকে। সে এক মহামারী কাণ্ড। কি যে ঘটিয়াছে কেহই

স্থির করিতে পারে না। নবাগত অপরিচিত যুবক এডিসন হঠাৎ প্রেসিডেন্টের সম্মুখীন হইয়া বলিয়া বসেন, তিনি মেশিন চালাইয়া দিতে পারেন। প্রেসিডেণ্ট বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে সেই বিরাট যন্ত্র আবার চলিতে থাকে। মাসিক তিনশত ডলার বেতনে তিনি সেখানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিতে পারিবেন কিনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। এডিসন যেন হাতে চাঁদ পাইলেন—তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, কোনও রকমে বলিয়া ফেলিলেন, তিনি কাজ লইবেন।

এখন হইতেই এডিসনের আসল কাজ আরম্ভ হইল—তিনি এই কোম্পানীর কাজে যে অল্প কয়েক দিন ছিলেন তাহার মধ্যেই কোম্পানীর বহু উন্নতি সাধন করিলেন এবং 'ষ্টক-প্রিণ্টার' সম্পর্কিত কয়েকটি আবিষ্কার করিয়া এক সঙ্গে ৪০০০০ ডলার পুরস্কার পাইলেন। তাঁহার বয়স তখনও বাইশ অতিক্রম করে নাই। তাঁহার প্রতিভার মূল্য এই তিনি প্রথম পাইলেন। এই অর্থের সাহায্যে তিনি নেওয়ার্কে এক বৃহৎ ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রায় ১৫০ জন লোককে নিযুক্ত করতঃ টেলিগ্রাফ সম্পর্কীয় যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে সুরু করিলেন।

ইহার পরেই আবিষ্কারের বন্যা, এডিসন বিখ্যাত হইলেন, তাঁহার টাকা আর ধরে না। একটার পর একটা নূতন জিনিষ তিনি আবিষ্কার করিতে থাকেন। পেটেণ্ট বিক্রয় হয়, টাকা আসে, সেই টাকা তিনি নূতন আবিষ্কারে ব্যয় করেন, শেষ জীবন পর্য্যন্ত ইহাই তাঁহার ইতিহাস। তাঁহার সমুদয় আবিষ্কারগুলির কথা বলিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়। আমরা তাঁহার বিখ্যাত

আবিষ্কারগুলির নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিব।

দ্বিগুণ (Duplex) টেলিগ্রাফ-প্রণালীকে তিনি এই সময়ে চতুর্গুণ Quadruplex) টেলিগ্রাফ-প্রণালী করিয়া ফেলেন—অর্থাৎ একই তারের দুই দিক হইতে এক সঙ্গে একই কালে দুইটি করিয়া চারটি সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা তিনি করেন। ইহাতে লাইন নির্ম্মাণে কোম্পানীর অসংখ্য টাকা বাঁচিয়া যায়। তারপর, তিনি ইলেক্‌ট্রো-মোটোগ্রাফ (Electromotograph) আবিষ্কার করিয়া দি ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়ান টেলিগ্রাফ কোম্পানীর নিকট এক লক্ষ ডলারে বিক্রয় করিয়া তদানীন্তন পেজ পেটেণ্টকে (Page patent) ঘায়েল করেন।

বেল (Bell) নামক এক ব্যক্তি এই সময়ে টেলিফোন আবিষ্কার করিয়াছিলেন কিন্তু এই আবিষ্কারকে বিস্তৃত ভাবে কাজে খাটাইবার অসুবিধাগুলি তিনি দূর করিতে পারিতেছিলেন না। এডিসন ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যবসায়ের দিক দিয়া ইহার সাফল্য আনয়ন করেন। কার্বন ট্রান্সমিটার তাঁহার আবিষ্কার; ইহার সাহায্যেই দূরে দূরান্তরে সংবাদ প্রেরণ সম্ভব হইয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র এই প্রণালীই অনুসৃত হয়। এই আবিষ্কার বেচিয়া তিনি দি ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানীর নিকট এক লক্ষ ডলার প্রাপ্ত হন।

১৮৭৭ সালের শরৎকালে তিনি তাঁহার বিখ্যাত ফনোগ্রাফ বা গ্রামোফোন আবিষ্কার করিয়া সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। ফনোগ্রাফ আবিষ্কার বিস্তারিত বর্ণনাসাপেক্ষ।

বর্ত্তমানে আমরা যে ইনক্যাণ্ডেসেণ্ট ইলেকট্রিক ল্যাম্প ব্যবহার করি তাহাও এডিসনের আবিষ্কারের ফল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর তারিখে তিনি প্রথম ইনক্যাণ্ডেসেন্ট ল্যাম্প নির্ম্মাণ ও ব্যবহার করেন। তৎপূর্ব্বে ধোঁয়াটে কার্ব্বন ল্যাম্প ব্যবহৃত হইত এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র বত্রিশ।

এডিসন ইলেকট্রিক লাইটিং-এর এক সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ডাইনামোও এইজন্য তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিতে হয়। ১৮৯১ সালে তিনি কয়েকটি নূতন জেনারেটার ও মোটর নির্ম্মাণ করেন। ১৮৮০-১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি আমেরিকায় বৈদ্যুতিক আলোক সরবরাহ পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া যুগান্তর আনয়ন করেন।

১৮৯১ সালের পর তিনি চলচ্চিত্র গ্রহণের উপযোগী যন্ত্র আবিষ্কারে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া যে অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছেন তাহার প্রভাব আজ বিশ্বব্যাপী।

সুবিখ্যাত এডিসন স্টোরেজ ব্যাটারী, পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট প্রস্তুতের প্ল্যাণ্ট, ডিস্ক ফনোগ্রাফ—কত নাম করিব? নরদেহী বিশ্বকর্ম্মার কার্য্যকলাপের পরিচয় দিতে হইলে গণেশের লিখনক্ষমতা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধপাঠে এডিসনের জীবন ও তাঁহার আবিষ্কার সমূহ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিবার বাসনা যাঁহাদের হইবে তাঁহাদিগকে ডব্লিউ. কে. এল. ডিকসন, এফ. এ. জোন্‌স ও এফ. এল. ডায়ার প্রণীত জীবনী পাঠ করিতে বলি।

এডিসনের ব্যক্তিগত জীবনও অদ্ভুত; তাঁহার জীবন সাধারণ

মানুষের জীবনের মত মোটেই ছিল না। এবিষয়ে সুবিখ্যাত হেনরী ফোর্ড ও সামুয়েল ক্রাউথার অনেক কথাই বলিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাহা হইতেই কিছু সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। মনে রাখিতে হইবে এডিসনের জীবিতকালে ইহা লিখিত হয়।

"—এডিসনের ঘুম লইয়া অনেক কথা বলা হইয়া থাকে। লোকে বলে, তিনি কখনও ঘুমান না। অত্যুক্তি হইলেও একথা সত্য যে তিনি প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ঘুমান না। কোনও দিন চার ঘণ্টা, কোনও দিন ছয় ঘন্টা, আবার কোনও দিন বা তিনি একেবারেই নিদ্রা যান না। যেদিন যেমন প্রয়োজন তিনি সেদিন সেই পরিমাণেই ঘুমাইয়া থাকেন। তিনি বলেন, যখন কোনও বিষয়ে গভীর গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন তখন বিছানায় শুইতে যাইবার অথবা পরিমাণ মত ঘুমাইবার প্রয়োজনই অনুভব করেন না। যতক্ষণ তাঁহার মস্তিষ্ক কাজ করে ততক্ষণ জাগিয়া থাকেন। যখন দেখেন মাথা আর কাজ করিতেছে না, যেখানেই থাকুন না কেন খানিকটা ঘুমাইয়া লন। তিনি কখনও স্বপ্ন দেখেন না। ঘুমাইবার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। আসলে সময়ের পরিমাণ দেখিলেই হয় না, ঘুমের গাঢ়তার উপরই সবটা নির্ভর করে। যখন তাঁহার কিছু করিবার থাকে না, তিনি ঘুমাইয়া শক্তিসঞ্চয় করেন।

তাঁহার খাওয়া সম্বন্ধেও এইরূপ—তিনি লম্বা-চওড়া বিরাটকায় পুরুষ—শক্তিশালীও কম নন। কখনও নিয়মিত ব্যায়াম করেন নাই; স্বভাবতই অত্যন্ত কর্ম্মঠ বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। সেদিন পর্য্যন্ত যখন যাহা খুসী খাইয়াছেন। যৌবনে তাঁহার

পয়সায় যতটা কুলাইত, ততটাই খাইতেন। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন কোন খাদ্য ভাল তাহা ঠিক করিয়া লইয়াছেন। তিনি তামাক খান চিবাইয়া—সিগারেট খাওয়া অত্যন্ত অপছন্দ করেন। মদ খান না।

তাঁহার সমস্ত জীবন এমনভাবে পরিচালিত যে তিনি তাঁহার শক্তিকে কিছুমাত্র অপব্যয়িত হইতে দেন না—যে কাজ করার তাহার প্রয়োজন নাই সে কাজ কখনও করেন না। সময়কে যথাসম্ভব কাজে লাগাইবার অভ্যাস হইতেই তাঁহার ঘুমের মাত্রা কমিয়াছে। পূর্ব্বে ল্যাবরেটরীতে একটি ঘড়ি থাকিত কিন্তু তাহা চলিত না। তিনি বলিতেন যে তিনি সময়ের দাস নহেন—ঘড়ির মাপে মাপে চলা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

তাঁহার হাতের লেখা গোটা গোটা, প্রত্যেকটি অক্ষর স্বতন্ত্র অথচ তিনি বিনা আয়াসে স্বচ্ছন্দে দ্রুত লিখিতে পারেন। টেলিগ্রাফিক 'মেসেজ' ধরিবার অভ্যাস হইতেই তিনি এইরূপ লিখন-ভঙ্গি আয়ত্ত করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অক্ষরগুলি খাড়া ভাবে লিখিলেই সব চাইতে দ্রুত লেখা যায়।

এডিসনের অভ্যাসগুলি একমাত্র তাঁহারই নিজস্ব—অন্যের পক্ষে এই সকল অভ্যাস অনুযায়ী চলা সম্ভব নয়।

এডিসন অত্যন্ত সহৃদয় কিন্তু মোটেই নরম প্রকৃতির নন। কোনও লোককে নিছক দয়া দেখাইয়া বাঁচাইয়া রাখা যায় ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না—তিনি বলেন, যে নিজেকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাহাকেই সাহায্য করা চলে। ম্যাকেঞ্জি নামক যে ষ্টেশন কর্ম্মচারীর

এডিসন ইলেকট্রিক লাইট আবিষ্কারে নিযুক্ত

কন্যাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া তিনি একদা টেলিগ্রাফী শিখিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন, উত্তরজীবনে সেই ব্যক্তিই সাহায্য-প্রার্থী হইয়া তাঁহার দ্বারস্থ হয়। সে চাকুরী প্রার্থনা করে।

এডিসন তাহাকে চাকুরী না দিয়া বলেন যে, নিউইয়র্কে একটি ফার্ম একটি বিশেষ ধরণের 'ফায়ার এলার্ম' তৈয়ারী করিয়া দিবার জন্য ৫০০০ ডলার মূল্য ঘোষণা করিয়াছে।—'তুমি সেই কাজ করিয়া টাকাটা উপার্জ্জন কর না কেন?' সে ব্যক্তি বলে, 'আমি এ ধরণের কাজ কখনও করি নাই। তা ছাড়া আমার টাকা কোথায়, ল্যাবরে-টরীই বা কোথায়?'

এডিসন তাহাকে তাঁহার ল্যাবরেটরীতে কাজ করিতে দিয়া কিভাবে কাজটা করিতে হইবে তাহা বলিয়া দেন। ম্যাকেঞ্জি নিজের চেষ্টায় উক্ত পুরস্কার শেষ পর্য্যন্ত লাভ করে, এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত এডিসনের ল্যাবরেটরীতে কাজ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। ইনক্যাণ্ডেসেন্ট ল্যাম্প নির্ম্মাণকার্য্যে ম্যাকেঞ্জিরও যথেষ্ট হাত ছিল।

এডিসন অত্যন্ত রসিক—প্রত্যেক জিনিষের হালকা দিকটা তিনি সহজেই ধরিতে পারেন এবং প্রত্যেক কথাকে গল্প দিয়া সরস করিতে ভালবাসেন। যাহাদের রসবোধ নাই তাহাদের তিনি এড়াইয়া চলেন।

যে যেমন মানুষ তিনি তাহাকে সেই ভাবেই দেখিতে ভালবাসেন। কাজে অক্ষমতা ছাড়া আর সকল কিছুকে সহ্য করার ক্ষমতা তাঁহার আছে।

এডিসনের কাছ হইতে কোনও উপকার পায় নাই, তাঁহার নিকট ঋণী নহে এমন লোককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে গভীরতম অরণ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। মানবসভ্যতা যতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে এডিসনের প্রভাব ততদূর পর্য্যন্ত। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ অধিবাসী হিসাবে তাঁহাকে নমস্কার করি।”

পুরাকালে নরওয়ে দেশে এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাদের 'ভাইকিং' বলত।

সমুদ্রের তরঙ্গে ছিল তাদের ঘর, ঝড় ছিল তাদের সাথী।

যখন তারা বৃদ্ধ হত, তখন বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় ঘরে তারা বসে থাকতে পারত না। পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার সময় নিকট হয়েছে জানতে পারলেই, একদিন তুমুল ঝড়ের মধ্যে, সমুদ্রে যখন ঢেউ পাগল হয়ে নাচতে থাকত, তারা ছোট্ট একখানি নৌকা নিয়ে তারই মধ্যে বেরিয়ে পড়ত,—হাতে থাকত চিরজীবনের সঙ্গী খোলা তলোয়ার, বুকে থাকত লোহার বর্ম্ম আঁটা,—পায়ের তলায় নাচত সমুদ্র, মাথার উপরে ডাকত বাজ, সেই নির্জ্জন, ভয়ঙ্কর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তারা নিঃশেষে নিজেদের বিলিয়ে দিত।

এ হ'ল বহুকাল আগেকার কথা।

আজ 'ভাইকিং'রা নরওয়ের সমুদ্র-উপকূল থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের আত্মা এখনও মাঝে মাঝে কোন কোন নরওয়েবাসীর মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠে আমাদের পরবশ জীবনে জানিয়ে দিয়ে যায় যে, সেই আদিম মানব-মন এখনও বেঁচে আছে, একা বেঁচে আছে সেই ভয়হীন মানুষের মন, একদা বিনা আয়ুধে বিনা বিজ্ঞানে যা নগ্ন-দেহ নিঃসম্বল মানুষকে সমগ্র প্রাণি-রাজ্যের সিংহাসনে বিজয়ী করে বসিয়েছিল।

রোয়াল্ড্ আমুণ্ডসেন্ হলেন নরওয়ের শেষ ভাইকিং। পুরাকালের ভাইকিংদের ডাকত তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, আমুণ্ডসেনকে ডেকেছিল মৃত্যু-হিম মেরু-তুহিন। সেই দিগন্ত-বিস্তৃত নিষ্কলঙ্ক মেরু-শুভ্রতার মধ্যে আমুণ্ডসেনের আত্মা মিশিয়ে আছে। দক্ষিণ-মেরুতে আছে তাঁর প্রথম পদরেখা, উত্তর-মেরুতে আছে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস।

দূর-দুর্গমতার আহ্বান রক্তের সঙ্গে নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ (১৮৭২) করেছিলেন। তাঁর বাবা বোট তৈরী করতেন। তাতেই তাঁদের সংসার চলত।

ছেলেবেলা থেকেই মেরু-অভিযানের কাহিনীগুলি বালক আমুণ্ডসেন্ তন্ময় হয়ে পড়ত। মনে মনে বালক স্যর জন ফ্রাঙ্কলিনকে জগতের শ্রেষ্ঠ বীর-পুরুষ বলে বরণ করে নিয়েছিল। তখন কে জানত এই বালকই একদিন ফ্রাঙ্কলিনের অসমাপ্ত কাজকে সার্থক করে তুলবে! মেরুসমুদ্রে ফ্রাঙ্কলিনের তিরোধানের সকরুণ কাহিনী বালকের মনকে অভিভূত করে তুলত।

তারা * দেখেছে চৌদ্দ দিন ধরে, অবিরাম অবিরত ছায়াহীন রাত্রি-দিনের মধ্য দিয়ে অবিচ্ছেদ চলেছে লক্ষ লক্ষ পেঙ্গুইন পাখীর দল! কোথায় সেই পেঙ্গুইন পাখীর জন-হীন বরফের দেশ? কোন মানুষের পায়ের দাগ এখনও সেখানে পড়েনি! আভের্গাস্ ঠেলে মানুষ কি খুঁজে পাবে না সেখানে পৌঁছবার পথ? কোন্ দেশের পতাকা সেখানে উড়বে প্রথম? কে সে বীর, যার পায়ের দাগ প্রথম পড়বে সেই হিম-মৃত্যুর বুকে?

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে বালকের অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বালকের যখন মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স, সেই সময় তার বাবা মারা গেলেন। প্রাণপণ চেষ্টা এবং কষ্ট স্বীকার করে বিধবা জননী ছেলেকে ডাক্তারী পড়াবার আয়োজন করলেন। কিন্তু ডাক্তার হবার কোন বিশেষ আগ্রহ ছেলের মধ্যে দেখা গেল না। ছেলের একমাত্র কাজ "স্কী" চড়ে বরফের উপর দিয়ে ছোটা এবং শীতের মধ্যে বরফের মধ্যে ঘরের বাইরে অষ্ট-প্রহর থাকা। এইভাবে প্রথম যৌবন থেকেই আমুণ্ডসেন শীত আর বরফের মধ্যে নিজেকে শক্ত করে গড়ে তুলতে লাগলেন—মনে তখন থেকেই তাঁর দুর্বার বাসনা, স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন যে-পথ খুঁজে পান নি, আভার্গাসের পাহাড় এড়িয়ে সেই পথ তিনি খুঁজে বার করবেন।

জীবনের প্রথম পরীক্ষারূপে তিনি ঠিক করলেন ভরা শীতে পায়ে হেঁটে অসলো থেকে বারগেন্ যাবেন। অর্থাৎ পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম সমুদ্র উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশটা পায়ে হাঁটবেন। একজন সঙ্গীও

* সাদার্ণ ক্রস পার্টি (Southern Cross Party)

ফুটে গেল। দুঃসাহসের প্রথম স্বাদ প্রথম অভিজ্ঞতাতেই পেতে হল। সেই তুষার-রাজ্যের মধ্যে তাঁরা পথ হারিয়ে ফেললেন। চার দিন অনাহারে সেই নিদারুণ শীত আর তুষারের মধ্যে চলে আসার পর তাঁরা নারগেনে এসে পৌঁছলেন। এই চার দিন অনাহারে তাঁরা যে কি করে কাটালেন, তা তাঁদের কাছেই বিস্ময়কর লেগেছিল।

সেই চারদিনের অনাহারে হলো মেরু-পথের প্রথম দীক্ষা।

কুড়ি বছর বয়সে তার সংসারের একমাত্র বন্ধন, তাঁর মা পরলোক গমন করলেন। মার ইচ্ছা এবং পীড়াপীড়িতেই তিনি ডাক্তারী পড়ছিলেন, মার মৃত্যুর পর তা ছেড়ে দিলেন। ছেড়ে দিয়েই তাঁর প্রথম ঝোঁক হল, নাবিকের কাজ শেখা। খুঁজে খুঁজে দক্ষিণ মেরু-সাগরযাত্রী এক জাহাজে শিক্ষানবীশ হয়ে ঢুকলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নাবিকের সার্টিফিকেট অর্জন করলেন; সেই সঙ্গে মেরু-সাগরের সঙ্গেও সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হলেন। সেদিন সে জাহাজে কেউ কল্পনাও করেনি যে, সেই সামান্য শিক্ষানবীশ ছেলেটির দৃষ্টি ছিল মেরু-সাগরের এক অপরতীরে পেঙ্গুইন পদ-রেখা অঙ্কিত তুষার-ভূমির দিকে।

পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনে একটা বড় সুযোগ এল। সেই সময় নরওয়ে থেকে বেলজিকা জাহাজে ডি গারলাচির (De Garlache) অধীনে দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারের জন্যে একটা অভিযান যাচ্ছিল। আমুণ্ডসেন বেলজিকার প্রথম "মেট্" হলেন। সেই জাহাজে আর্কটউস্কী প্রভৃতি সেই সময়কার বড় বড় মেরু-আবিষ্কারকেরা ছিলেন। আমুণ্ডসেন্ সেই সুযোগে তাঁদের সঙ্গে পরিচিতও হলেন।

আমুণ্ডসেন ও তাঁহার শ্লেজ-পার্টি

কিন্তু এই অভিযান বিশেষ সফল হল না। দক্ষিণমেরু অঞ্চলের গ্রাহাম ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত গিয়ে তাঁরা বরফে আটকা পড়ে গেলেন। সেইখানে সেই অবস্থায় তাদের এক বছর কাটাতে হয়। তারপর তাঁরা ফিরে আসেন। অভিযান ব্যর্থ হলেও, সেই জাহাজের একজন নাবিকের কাছে সেই অভিযানের বিশেষ সার্থকতা ছিল। সেই প্রথম, আমুণ্ডসেন্ তুষারাচ্ছন্ন ছেদ-হীন দীর্ঘ মেরু-রাত্রির সঙ্গে পরিচিত হলেন।

তাঁর উদগ্রীব মন শুধু ভাবছিল,—কবে, কবে আসবে তাঁর লগ্ন? তারই অপেক্ষায় তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে তৈরী করে তুলছিলেন।

এই সময় হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি দক্ষিণ-মেরু থেকে একেবারে উত্তর মেরু-সাগরে গিয়ে পড়ল। এখানে একটু ভূমিকা করা দরকার।

মেরু-আবিষ্কারের ইতিহাসে নর্থ-ওয়েস্ট প্যাসেজ বলে একটা সমুদ্র-পথের উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। প্রায় চারশ বছর ধরে য়ুরোপের নাবিকেরা উত্তর-য়ুরোপ থেকে সোজা পশ্চিম-দিকে গিয়ে উত্তর-আমেরিকার উত্তর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে আসবার সমুদ্র-পথ খুঁজছিল। এই সমুদ্র-পথকেই বলে নর্থ-ওয়েস্ট প্যাসেজ,—এই সমুদ্র-পথের মত দুর্গম সমুদ্র-পথ আর নেই বললেই হয়। তবুও এই পথ খুঁজে বার করবার জন্যে উত্তর-মেরুর সমুদ্র-পথে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন। এই পথ খুঁজতেই স্যর ফ্রাঙ্কলিন তাঁর লোকজন সমেত মেরু-সাগরে অদৃশ্য হয়ে যান। আবিষ্কারের ইতিহাসে সে এক অতি সকরুণ কাহিনী।

আমুণ্ডসেন ঠিক করলেন যে, মেরু-সাগরের মধ্য থেকে তিনি সেই উত্তর-পশ্চিম পথ খুঁজে বার করবেন। কিন্তু চারশ বছর ধরে দেশ-বিদেশের নাবিকেরা লোকজন সহায়-সম্বল নিয়ে যা পারে নি, তিনি একা নিঃসম্বল অবস্থায় কেমন করে তা পারবেন? তার উপর আর একটা বিশেষ কথা ছিল যে, চুম্বক-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকলে মেরু-সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে যাওয়া আদৌ নিরাপদ নয়। কিন্তু কে তাকে শেখাবে?

অনেক কষ্টে তিনি ন্যানসেনকে ধরলেন। কিন্তু কিউ অব্ জারভেটরী তাঁকে শিক্ষা দিতে রাজী হল না! সেখান থেকে বিফল-মনোরথ হয়ে তিনি পোস্টডামে চেষ্টা করলেন। সেইখান থেকেই তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় বিদ্যা আয়ত্ত করলেন।

তা না হয় হল, কিন্তু মেরু-সাগরে যাবার মত জাহাজ কোথায়? অত ভাল জাহাজ ভাইকিং-এর না হলেও চলে! মাত্র পঞ্চাশ টনের একখানি মাছ-ধরা জেলে-নৌকা পুরাণো অবস্থায় পড়ে ছিল। সেইটে তিনি টাকা ধার করে অল্প দামে কিনে নিলেন। তারপর সেটাকে নিজের হাতে মেরামত করে নিলেন। সেই তো হ'ল তাঁর জাত ব্যবসা!

সঙ্গী যাঁদের পেলেন, তারাও ঠিক তারই মত দুর্দ্দান্ত উন্মাদ! পুরো ভাইকিংদের বংশধর সব!

এই সামান্য আয়োজন করে ১৯০৩ সালে আমুণ্ডসেন্ উত্তর-মেরু সাগরের দিকে যাত্রা করলেন, উত্তর-পশ্চিম-পথ খুঁজে বার করতে—যে-পথ চারশ বছরের চেষ্টাকে বারে বারে ব্যর্থ করে আভালাঁসের দুর্গমতার মধ্যে লুকিয়ে ছিল।

প্রথমে ফ্রাঙ্কলিনের পথ অনুসরণ করে তিনি চলতে লাগলেন। ক্রমশঃ ফ্রাঙ্কলিনের সীমানা ছাড়িয়ে "ব্যাফিন বে"র মধ্য দিয়ে ল্যাঙ্কাস্টার সাউণ্ড এবং ব্যারো ষ্ট্রেটের ভিতর দিয়ে, জ্য লা রোকেয়েং ক্যাপের ধার দিয়ে উত্তর-মেরুকে পাশ কাটিয়ে তিনি সিম্প্সন্ ষ্ট্রেটে এসে নোঙর ফেললেন। আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। শীতে চারিদিক জমে বরফ হয়ে আসছে! শীত কাটাবার জন্যে বাধ্য হয়ে তাকে সেখানে থাকতে হল। দুর্ভাগ্যক্রমে দু'বৎসর তিনি সেখানে আটক পড়ে থাকেন। তারপর ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসে তিনি আবার যাত্রা করেন। "ম্যাকেঞ্জী বে"র ধারে "কিঙ্ পয়েন্ট" পর্য্যন্ত যেতে না যেতেই আবার এসে গেল শীত। বাধ্য হয়ে সেখানে আটকে থেকে হ'ল।

কিন্তু এবার তিনি চুপ করে বসে রইলেন না। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে থেকেই তিনি একটা স্লেজ-পার্টি গড়ে তুললেন। স্লেজে করে তারা ১৫০০ মাইল দূরে আলাস্কার ঈগল সিটীতে গেলেন এবং সেখান থেকে ফিরে এলেন।

১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে আবার অভিযান সুরু হ'ল। নানা বিপদ এবং অভাবনীয় সব দৈব আক্রমণের হাত এড়িয়ে ১১০০ মাইল পথ অতিক্রম করে, তারা ১৯০৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর "বেরিং ষ্ট্রেট" পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়লেন। চারশ বছর ধরে যে পথ খোঁজা হচ্ছিল, সে-পথের দিশা সেদিন পাওয়া গেল!

সেখান থেকে আমুণ্ডসেন্ আমেরিকাতে ফিরলেন। উত্তর-পশ্চিম-পথের সন্ধানদাতারূপে আমুণ্ডসেনের নাম জগতের চারিদিকে

ছড়িয়ে পড়ল। আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি টাকা রোজগার করতে লাগলেন। সেই টাকাতে তিনি সব ধার শোধ দিলেন। আমেরিকা ছেড়ে চলে আসবার সময়, যে জাহাজে উত্তর-পশ্চিম পথ পার হয়েছিলেন, সে জাহাজখানি তিনি রেখে আসেন।

আজও পর্যান্ত সান ফ্রান্সিস্কোর গোল্ডেন গেট্ পার্কে এই ঐতিহাসিক কীর্ত্তির স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ সেই জাহাজখানি সংরক্ষিত রয়েছে।

সান-ইয়াৎ-সেন

এক

চীনের নব-জন্মদাতা সান-ইয়াৎ-সেন তাঁহার মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে চীন জাতির আত্ম-সম্মান-বোধের উপর নির্ভর করিয়া তাহার অন্তিম বাসনাকে উইলের আকারে রূপ দিয়া যান। উইলটা এইরূপ—

"চীনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাম্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া গণ-বিপ্লব চালাইয়া আসিয়াছি। সে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি যে, জনগণকে জাগাইতে না পারিলে এ সংগ্রাম বৃথা এবং তাহার জন্য যে-সমস্ত জাতি আমাদের সহকর্মী হিসাবে সমকক্ষ মনে করে, তাহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে হইবে।

"যে-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহার জয়যুক্ত সমাপ্তি আজও বহু দূরে। যে-পদ্ধতি অনুসারে সেই সংগ্রাম চালাইতে হইবে, তাহা আমার পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়া গেলাম। যত দিন না জয় সম্পূর্ণভাবে

করতলগত হয়, তত দিন পর্য্যন্ত যেন বিরাম-বিহীন সাধনা জাতির প্রত্যেকের মধ্যে সজাগ হইয়া থাকে।"

চীনের সে-সংগ্রাম আজও শেষ হয় নাই। প্রত্যেক চীনবাসী চীনের নবজন্মদাতার এই শেষ-বাণী স্মরণ করিয়া, জাতির আত্ম-মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মৃত্যু-পণ করিয়া আজ সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে।

দুই

ক্যান্টনের এক নিভৃত পল্লীতে যখন সন্ধ্যা নামিয়া আসিত, একটী শিশু তখন এক বৃদ্ধার কোলের উপর বসিয়া বিস্মিত-নেত্রে গল্প শুনিত —সুদূর সমুদ্রের পরপারে কোথায় এক দেশ আছে, তাহার মাটিতে সোনা, সেখানে গেলে আর নাকি ফিরিয়া কেউ আসে না।

সাগরের শেষে সেই সোনার দেশে শিশুর মন কল্পনার মায়ারথে চলিয়া যাইত।

তখন ক্যালিফোর্ণিয়ায় সোনার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রচুর অর্থ-লোভ দিয়াও তখন ক্যালিফোর্ণিয়ায় খনিতে কাজ করিবার জন্য কুলী পাওয়া যাইত না। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যাহারা প্রথম প্রথম কুলীর কাজ করিত, অচিরকালের মধ্যেই তাহারা মালিক সাজিয়া বসিয়া যাইত। সেই জন্য সেই সময় আড়কাঠির সহায়তায় বিদেশী ধনিকরা চীনের গ্রাম হইতে লোক ধরিয়া লইয়া ক্যালিফোর্ণিয়াতে পাঠাইয়া দিত। গ্রামের লোকেরা দেখিত, গ্রাম হইতে সহসা লোক অন্তর্হিত হইয়া যায়, আর জীবনে তাহাকে কেহই দেখিতে পায় না।

তাই গ্রামের বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে একটা বিশেষ ভয়ের স্মৃতি গ্রামবাসীদের মনে জাগরূক থাকিত।

কচিৎ কেহ ফিরিয়াও আসিত। বালক খবর পাইলেই উৎসুক হইয়া তাহার নিকটে গিয়া তাহার ভ্রমণকাহিনী শুনিত—অপরূপ দেশ, অপরূপ লোক!

গ্রামের অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া বালক তৃপ্ত হইত না। গ্রামের অলস জীবন বালকের ভাল লাগিত না।

চোয়-হাঙ, অর্থাৎ যে গ্রামে সেই বালকটী বাস করিত, সেখানে জীবনের কোথাও সময়ের পরিবর্তনশীলতার কোনও চিহ্ন ছিল না। সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে পাঠশালায় সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গুরু মহাশয়ের বেতের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের নিম্নে ছাত্রেরা তারস্বরে চীৎকার করিয়া ক্রবাঁধা জিনিস সব মুখস্থ করিত। সেই তেমনি সন্ধ্যাবেলায় গ্রাম-দেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণে লুটাইয়া পড়িয়া দিনের ধর্ম্মকার্য্য সকলে সমাপ্ত করিত। নিশীথ-রাতে সহসা কোথা হইতে মশালের আলোয় সারা গ্রাম রাঙা হইয়া উঠিত, দস্যুর দল আসিয়া গ্রাম লুটপাট করিয়া দস্যুদেহ ফিরিয়া যাইত। বালক ওয়েন (গ্রামের লোকে তাহাকে ঐ নামে চিনিত—জগতের লোকে তাহাকে সান-ইয়াৎ-সেন নামে চিনে) স্তব্ধ বিস্ময়ে সেই সমস্ত লক্ষ্য করিত।

তিন

বালক সানের মনে কিশোরকালের নানা স্বপ্নের সহিত একটা কথা সর্ব্বদাই জাগিয়া উঠিত যে, হয় ত তাহার সকল প্রশ্নের উত্তর

তাহাদের গ্রামের বাহিরে কোথাও তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে একবার কোনও রকমে গ্রাম ছাড়াইয়া যাইতে পারিলেই যেন তাহার সকল প্রশ্নের উত্তর মিলিয়া যাইবে।

বালক সানের মনে বিদেশে যাইবার আকাঙ্ক্ষা বদ্ধমূল হইয়া বসিল। সানের আর দুই ভাই বাড়ীর অনুশাসন না মানিয়াই হনলুলু বলিয়া কোথায় চলিয়া যায় আর ফিরিয়া আসে নাই, সেই জন্য সানদের পরিবারে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপার একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাড়ীর লোকেরা যখন তাহাদের ফিরিয়া আসার আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিল, সেই সময় সহসা সানের বড় ভাই বিদেশ হইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল। প্রবাসগত পুত্রের বাড়ী ফিরিয়া আসার দরুণ বাড়ীর লোকেরা আনন্দিত হইল, কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই বড় ভাই পুনরায় হনলুলু যাত্রা করিবে জানাইল এবং সেই সঙ্গে সানও আবেদন জানাইল যে, তাহাকেও যাইতে হইবে। কোনও মতে বালক কাহারও কথা শুনিবে না। সে যাইবেই!

অগত্যা ১৮৭৯ সালে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পিতামাতার অশ্রুজলের মধ্য দিয়া সান বিদেশে যাত্রা করিল।

হনলুলুতে আসিয়া সান সর্ব্বপ্রথম বাহিরের জগতের বৃহত্তর জীবনের সংস্পর্শে আসিল। হনলুলুর চীনামাটির উপর তখন বিলাতী-মাটির কাজ ভাল রকম সুরু হইয়া গিয়াছে। হনলুলুর এক দিকে চীন, অপর দিকে আমেরিকা। এই বিচিত্র সংমিশ্রণের দরুণ হনলুলু সানের মনকে বেশী করিয়া আকর্ষণ করিল।

হনলুলু হইতে চোয়-হাঙে ফিরিয়া আসিয়া এই দুই জীবন-ধারার

সমস্যা সানের চোখের উপর খুব বড় হইয়া উঠিল। সান দেখিল যে, চোয়-হাঙ এবং তাহার মত চীনের শত সহস্র গ্রাম এক বিরাট অজ্ঞতার আবরণে নিশ্চিন্তভাবে ঢাকা।

চার

গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া সানের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। গ্রামের সকল কাজের মধ্যে নিয়ত তাহার একটা বিরাট অসঙ্গতি বোধ হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের মনে এক নূতনতর চীনের ছায়া-মূর্তি আভাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত—এই চোয়-হাঙ, এইখানে নূতনতর স্কুল স্থাপনা করা হইয়াছে—এই দীন দরিদ্র জীবন, তাহার পরিবর্তে এক আলোকোজ্জ্বল মায়াপুরী জাগিয়া উঠিয়াছে আর তাহার পুরোভাগে সংস্কারক-রূপে বিরাজ করিতেছে সান।

সান মনস্থ করিল যে, গ্রামের ছেলেদের মনের কথা খুলিয়া দিবে। যে আশা আজ তাহার বুকে বাসা বাঁধিয়াছে, সকল যুবকের বুকে সে তাহার নীড় রচনা করুক!

মাঠের মাঝখানে ক্রীড়ারত বালকদের একত্রিত করিয়া সান গল্প বলে এবং কথাশেষে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ নিয়মের বশে তাহারা এই রকম প্রশ্নহীনভাবে অজ্ঞতার একাধিপত্যকে মানিয়া চলিয়াছে? গ্রামের বাহিরের বৃহত্তর জীবনের পথে যাত্রা করিতে কে তাহাদের আটকাইয়া রাখিয়াছে?

গ্রাম-বৃদ্ধরা পুত্রদের নিকট হইতে সানের এই সমস্ত কথা শুনিয়া

সচকিত হইয়া উঠিলেন। তবে তাঁহারা সানকে ভালবাসিতেন বলিয়া প্রথম প্রথম কিছু বলার প্রয়োজন মনে করিলেন না।

ছেলেরা মজা পাইয়া সানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এক দিন সান সহসা প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা জান, তোমাদের রাজা কে?"

"কেন, দেবদূত স্বয়ং মাঞ্চু-রাজ!"

"সেই দেবদূত কি তোমাদেরই স্বজাতীয়?"

"নিশ্চয়ই! চীনা ব্যতীত কেহই আর ভগবানের সন্তান হইতে পারেন না!"

সান তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে একটা মুদ্রা বাহির করিয়া সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, "যদি সে চীনা হয়, তবে সে কেন চীনা ভাষা ব্যবহার করিবে না? মুদ্রার উপরে এই দেখ মাঞ্চু ভাষার হরফ। তোমরা জান না, যে, মাঞ্চুরা চীনা নয়—তাহারা বিদেশী; আর বিদেশী বলিয়াই আমাদের এমনই অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিয়াছে।"

গ্রাম-বৃদ্ধরা সানের সহিত মিশিতে পুত্রদের বারণ করিয়া দিলেন।

গ্রাম ছাড়িয়া সান সোজাসুজি হংকংএ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হংকং বৃটীশ উপনিবেশ। হংকংএ আসিয়া এক মিশনারীর সাহায্যে সান Queen's Collegeএ ভর্ত্তি হইলেন।

সান যখন Queen's Collegeএ পড়িতেছিলেন, সেই সময় চীনাদের সহিত ফরাসীর যুদ্ধ চলিতেছিল। অবশ্য ফলাফল প্রতিবারেই যেরূপ হয়, এবারেও তাহা হইতেছিল। সেই সময় হংকংএর এক কারখানায় একখানি ফরাসী জাহাজ ভগ্নাবস্থায় মেরামতের জন্য আসে। এমনি বিড়ম্বনা যে, সে কারখানার সমস্ত কুলী চীনা।

সান-ইয়াৎ-সেন একটি মুদ্রা বাহির করিয়া সব চীনা যুবকদের দেখাইলেন।

তাহারা এক জোটে কাজ ছাড়িয়া দিল—বলিল, "ও জাহাজ কোন চীনা মেরামত করিবে না।"

এই ঘটনা বিশ বৎসরের যুবকের বুকে একটা নূতন পথ যেন খুলিয়া দিল। সেই দিন হইতে দিবারাত্র সানের মনে নানা প্রকারের অদ্ভুত কল্পনা নিত্য আসা-যাওয়া করিতে লাগিল—কোন্ পথে কোথায় স্বদেশের মুক্তি-মন্ত্রের স্বর্ণ-মন্দির রহিয়াছে?

সেই সময় ক্যান্টনে আমেরিকানরা নূতন হাসপাতাল ও ডাক্তারীর কলেজ খুলিতেছিল। সান ঠিক করিলেন যে, জনসাধারণের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশিতে হইলে ডাক্তারের বহিরাবরণ সব চেয়ে কম সন্দেহ-জনক ও বেশী প্রয়োজনীয়। এই স্থির করিয়া তিনি ক্যান্টনে Pak Tasi Medical Schoolএ ভর্তি হইলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন মাত্র চীন যুবককে লইয়া "নবীন চীন সঙ্ঘ" গড়িলেন।

এই সময় হইতেই সান বিপ্লবের কার্য্যে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দিনের বেলা স্কুলে কাটিত; রাত্রিতে এই সভার অধিবেশন হইত। ক্রমশঃ এই দলটি যখন পাকা হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপদ্ধতিও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তখন সান কাজের সুবিধার জন্য হংকংএর মেডিক্যাল কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন এবং আড্ডাটিকেও হংকংএ তুলিয়া আনিলেন। ১৮৯২ সালে এই কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া সান ম্যাকাও শহরে আসিয়া ডাক্তারখানা খুলিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে তিনি ক্যান্টন, হংকং ও ম্যাকাও শহরে বহু শাখা-সমিতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সমস্ত সমিতির কেন্দ্র হইল, সানের ডাক্তারখানা। সানের ডাক্তারখানা

হইতে রোগীরা শুধু দেহের রোগের ঔষধ লইয়া ফিরিত না। এই অদ্ভুত ডাক্তারটি রোগীদের মনে এক নূতন ধরণের বাণী জাগাইয়া তুলিত। কৃতজ্ঞ রোগী ডাক্তারের কথার সত্যতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইত।

সানের সেই ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠা হইতে মাঞ্চু-রাজবংশ ধ্বংসের সময় পর্য্যন্ত ভয়ানক ও কঠোর জীবন সানকে যাপন করিতে হইয়াছিল।

আজ যে দল জাপানের বিরুদ্ধে চীনকে জাগাইয়া রাখিয়াছে, সেই কুয়ো মিংটাঙ্ দল সান বিদেশী রাষ্ট্র এবং আমেরিকা-প্রবাসী চীনাদের সাহায্যে প্রথম ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১১ সালে এই দল প্রকাশ্য বিপ্লব ঘোষণা করে। তখন সান ইংলণ্ডে নির্বাসিত জীবন যাপন করিতেছিলেন। বিপ্লবের সংবাদে তিনি চীনে ফিরিয়া আসেন। মাঞ্চু-রাজের প্রধান সেনাপতি য়ুয়ান-শি-কাই কুয়ো মিংটাঙ্ দলের সহিত যোগদান করিলেন। তাহার ফলে বিপ্লবীরা জয়যুক্ত হইল। কিন্তু য়ুয়ান-শি-কাই ক্রমশঃ এই জয়ের সুযোগ লইয়া নিজেই সম্রাট সাজিয়া বসিতে চাহিলেন। তখন সান তাহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিপ্লব ঘোষণা করিলেন। ১৯২১ সালে এই বিপ্লব জয়যুক্ত হয় এবং দক্ষিণ চীনে নবীন চীনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাঃ সান হইলেন তাহার প্রথম সভাপতি। নানকিং হইল, এই নবীন চীনের রাজধানী। ডাঃ সান সেইখান হইতে সমগ্র চীনকে এক শাসন-তন্ত্রে আনিবার জন্য এক বিরাট আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন। তিনি চীনকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে, জগতের নবীন জাতিদের সঙ্গে তার আসন নির্দ্দিষ্ট করে চলে যান, কিন্তু সেদিনকার সংগ্রাম আজও শেষ হয় নাই।

টুটেন-খামেনের নাম শুনেছ? মিশরের রাজা টুটেন-খামেন?

সে অনেক দিন আগেকার কথা। এখন থেকে তিন হাজার বছর আগে, তিনি ছিলেন মিশরের রাজা। এই তিন হাজার বছর ধরে মাটির তলায় সকলের অগোচরে, সোনায় আর হাতীর দাঁতে মোড়া কবরের মধ্যে পরমানন্দে তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। হয়ত এমনিতর তিনি ঘুমিয়ে থাকতেন অনাদিকাল ধরে। হঠাৎ দুটি দুরন্ত মানুষ তিন হাজার বছরের নিশুতি সেই কবরের সঙ্গোপন শান্তি ভেঙে দিল। কেন? তারই কাহিনী তোমাদের আজ বলব।

তার আগে অন্য দু'একটা কথা তোমাদের বলে নিই। ইতিহাসে তোমরা প্রাচীন মিশরের গৌরবের কথা পড়েছ। তারা পিরামিড গড়েছিল—আজকালকার এঞ্জিনীয়াররাও সেই পিরামিডের গঠন দেখে অবাক হয়ে যান। এই পিরামিডগুলো সেই প্রাচীন রাজাদের কবর। তার ভেতর মাটির নীচে বড় বড় ঘর তৈরী করা হত, সেই ঘরে রাজার দরকারী সব আসবাবপত্র থরে থরে সাজিয়ে রাখা হত। তারপর

রাজা যখন দেহত্যাগ করতেন, সেইখানে তাঁর দেহকে সযত্নে রেখে দেওয়া হত। জীবনে তাঁর যে-সব জিনিষের দরকার হত, তাঁর সিংহাসন, বই, দাসদাসী, খাদ্য, নৌকা, অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, মৃত্যুর পর তাঁর কবরে সমস্তই থরে থরে সাজিয়ে রেখে দেওয়া হত। কারণ, তারা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের দুটি করে আত্মা থাকে। একটির নাম হল 'কা' আর একটির নাম হল 'বাই'; মৃত্যুর পর 'বাই'-আত্মা আকাশের ওপারে স্বর্গে চলে যায়। আর 'কা'-আত্মা মৃতদেহের সঙ্গে থেকে যায়। যতদিন 'কা'-আত্মা সেই দেহে তৃপ্ত হয়ে থাকে, ততদিন 'বাই'-আত্মাও স্বর্গে সুখে থাকে। 'কা'-আত্মার তৃপ্তি এবং প্রয়োজনের জন্যে সমস্ত জিনিষেরই প্রয়োজন, যেসব জিনিষ জীবিত দেহের মধ্যে থেকে সে ভোগ করেছিল।

আমরা জীবনকে সাজাই নানা অলঙ্কারে, নানা শোভায়; তারা মৃত্যুকে সাজাত, নানা অলঙ্কারে, নানা শোভায়। তাই আমাদের শ্মশান খুঁড়ে আমরা কিছু পাই না—ওদের শ্মশান খুঁড়ে ওদের সমস্ত প্রাচীন দিনের সমস্ত কথা আমরা সাক্ষাৎভাবে জানতে পেরেছি। তারা কি বলত, কি পরত, কি কাজ করত, কি বই লিখত, কি কি জিনিষ তৈরী করতে জানত, কি ভাবে জীবন যাপন করত, তার সমস্ত খবর তারা আমাদের জন্যে যোগাড় করে রেখে তবে মরেছিল। আজকালকার ঐতিহাসিকরা মাটী খুঁড়ে সেই সব কবর থেকে যে সব জিনিস উদ্ধার করেছেন, তাই দিয়ে প্রাচীন মিশরের সভ্যতার ইতিহাস লেখা হয়েছে।

অজানা দেশ আবিষ্কারের কাহিনী তোমরা পড়েছ। এও এক

রকম অজানা দেশ আবিষ্কারের কাহিনী। কোথায় মাটীর তলায় কোন রাজা ঘুমিয়ে আছে, হয়ত তার কবরে এমন সব জিনিস বা লেখা পাওয়া যাবে, যাতে ইতিহাসের অনেক শূন্য পাতা ভরাট হয়ে উঠবে। তাই দেশ দেশান্তরের ঐতিহাসিকেরা যেখানে প্রাচীন মিশরের রাজাদের কবর থাকা সম্ভব মনে করেছেন, সেইখানেই অসাধ্য পরিশ্রম করে মাটী খুঁড়েছেন। কখনও জয়যুক্ত হয়েছেন, কখনও বা বিফল হয়েছেন। সাত বছর আট বছর ধরে শত শত লোক লাগিয়ে রাত্রিদিন পরিশ্রম করে যখন মাটীর নীচে কবরে পৌঁছন গেল, তখন হয়ত দেখা গেল যে কবর শূন্য, রাজার মৃতদেহও নেই, ঘরে কোনও আসবাবপত্রও নেই, এদিক ওদিক ভাঙ্গা কাঠ বা পাথর খানকতক ছড়ান আছে। ব্যাপারটা কি? ঐতিহাসিকরা আসবার আগে ডাকাতরা সব চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। সাত বছরের সমস্ত শ্রম হয়ে গেল পণ্ড!

গত শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকা, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে কবর খোঁড়ার যে সব চেষ্টা হয়, প্রায় সবগুলিই এই ভাবে বিফল হয়ে যায়। অত গভীর মাটীর তলায় কারা এইভাবে ডাকাতি করে সব নিয়ে গিয়েছিল?

যখন মিশরের রাজাদের ক্ষমতা ক্রমশঃ কমে এলো, তখন নানা-রকমের অনাচার দেখা দিতে লাগল। যেসব পুরোহিতদের ওপর কবর রক্ষা করবার ভার থাকত, সোনার লোভে তারাই সর্ব্বপ্রথম কবরের জিনিষপত্র সরাতে লাগলেন। এক এক কবরে এক একটা রাজার ঐশ্বর্য্য জমা থাকত। সুতরাং দেশে যতই অভাব অনটন বাড়তে লাগল,

ততই এক দল লোকের দৃষ্টি কবরগুলোর উপর গিয়ে পড়ল। যিশুখৃস্ট জন্মাবার প্রায় হাজার বছর আগে একদল দস্যু লোভে পড়ে কবর-গুলোর ওপর ডাকাতি আরম্ভ করল। এত মজুত ঐশ্বর্য্য আর কোথায় পাবে? এই ভাবে সেই সময় বহু কবর শূন্য হয়ে যায়।

এই ভাবে বহুদিন লুটতরাজ চলতে থাকে। তার পর কয়েকজন রাজা আবার শক্তিশালী হয়ে এই দস্যুতা বন্ধ করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। যতদূর পারলেন তারা কবরগুলো সাজিয়ে, তার দরজায় শীলমোহর দিয়ে ভেতরের গোপন প্রবেশ-পথটি পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। যারা এই দস্যুতার অপরাধে ধরা পড়ত তাদের কঠিন সাজা হত। যে সব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তাতে মাঝে মাঝে এইসব দস্যুদের বিচারের কাহিনী লেখা আছে। একটা পুঁথিতে একজন দস্যুর নিজের জবানবন্দী লেখা আছে। সে বলছে, "আমরা সকলে মিলে কবরের ভিতর গিয়ে ঢুকলাম। যত বাক্স ছিল সব ভেঙ্গে ফেললাম। যেটাতে রাজার মৃতদেহ ছিল, সেটাও ভাঙ্গা হল। তার কারণ সেটা আগাগোড়া সোনা দিয়ে মোড়া ছিল। খুলতেই দেখি মহামহিমান্বিত সম্রাট ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর অঙ্গে দামী দামী সব গহনা। সমস্ত গহনা টেনে ভেঙ্গে খুলে নিলাম। সমস্ত জিনিষ-পত্রে আগুন ধরিয়ে দিলাম।"

এইভাবে কবরগুলো সব শূন্য হয়েছিল।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে সমস্ত আবিষ্কারক মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে যখন সবাই বিফল হলেন, তখন সকলেই আশা ত্যাগ করলেন যে, এ

জায়গায় আর কোনও কবর নেই। সমস্ত ঐতিহাসিক একবাক্যে বল্লেন যে, এখানে মাটি খোঁড়া পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

সবাই যখন কোদাল-খোন্তা সরিয়ে যে যার দেশে চলে গেলেন, তখন থিওডর ডেভিস্ বলে একজন আবিষ্কারক সেই মাটী কামড়ে বসে রইলেন। তিনি আর ফিরলেন না। বারবার তিনি বিফলমনোরথ হয়েছেন, কিন্তু তবুও তাঁর আশা ছিল যে, দুই একটা কবরের দেখা এখনও পাওয়া যেতে পারে। সেটা হল ১৯০৫ সাল। বহু বছর মাটী খোঁড়ার পর তিনি সত্যিই একটা কবরের সন্ধান পেলেন। সেটা অবশ্য কোনও রাজার নয়, তবে তাঁরা রাজ-বংশের লোক। এবং তাঁদের কবরে বহু জিনিষও পাওয়া গেল।

এই আবিষ্কারের ফলে কিছুদিন আবার একটু উৎসাহ দেখা দিল। কিন্তু আর কিছুই পাওয়া গেল না। ১৯১২ সালে ডেভিস্‌ও বল্লেন যে, এখানকার মাটীর তলায় আর কিছুই নেই।

কবর খোঁড়বার জন্যে প্রত্যেক লোককে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। ১৯১৪ সালে ডেভিসের সময় ফুরিয়ে গেল। তিনি নিশ্চিন্ত মনে চলে এলেন এই ভেবে যে, আর কিছুই পাওয়া যেতে পারে না। ডেভিস এই কাজ ছেড়ে দেওয়ার পরই, দুজন লোক অনুমতির জন্যে আবেদন করলেন। একজনের নাম লর্ড কার্‌নার্‌ভন, আর একজনের নাম হাওয়ার্ড কার্টার। সকলেই বিস্মিত হলেন যে, তাঁরা কেন অকারণ এই পণ্ডশ্রম করতে যাচ্ছেন।

বহুদিন ধরে হাওয়ার্ড কার্টারের মনে একটা স্বপ্ন ছিল। তিনি

দেখতেন যে, মিশরের রাজা টুটেন্-খামেনের কবর এই মাটীর তলায় লুকিয়ে আছে। ডেভিস্ একবার একটা পাত্র পান, তাতে টুটেন্-খামেনের শীল-মোহর ছিল। কিছুদিন আগেও এখানে টুটেন্-খামেনের আগে যিনি রাজা ছিলেন, তাঁর কিছু কিছু স্মৃতি-চিহ্ন মাটীর তলা থেকে পাওয়া গিয়েছে। যে-বিশ্বাস কলম্বাসকে শক্তি দিয়েছিল—যার ইঙ্গিতে সমস্ত উন্মাদ নাবিকদের বিপক্ষে পারাপারহীন সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে পেরেছিলেন যে, সমুদ্রের ওপারে নিশ্চয়ই আছে মাটী—সেই বিশ্বাস ছিল কার্টারের মনে। আর তো[illegible] জেনো, [illegible] বড় আবিষ্কারের পেছনে আছে এই রহস্যময় বিশ্বাসের অপূর্ব্ব ইঙ্গিত!

কাজ আরম্ভ করবার সমস্ত আয়োজন যখন শেষ হয়েছে, তখন হঠাৎ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। অগত্যা সমস্ত আয়োজনই বন্ধ রাখতে হল। তিন বছর পরে কাজ আবার আরম্ভ হল। একটা জায়গা নির্দ্দিষ্ট করে নিয়ে সেখান হতে খোঁড়ার কাজ আরম্ভ হল। উপরের স্তূপীকৃত জঞ্জাল সরিয়ে, থাকের পর থাক মাটী কেটে যাওয়া, দিনের পর দিন!

এক বছর কেটে গেল, দুবছর কেটে গেল, তিন বছর কেটে গেল, একটিও পাথরের টুকরো পাওয়া গেল না। দেখতে দেখতে চার বছর শেষ হয়ে যেতে চলল। দিনের পর দিন, কোদালের প্রত্যেক কোপের সঙ্গে বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে, এইবার, এই মাটির চাব্‌ড়াটা উঠালেই হঠাৎ ঠং করে শব্দ হবে—একটা দরজা, দরজায় শীল-মোহর এখনও কেউ ভাঙ্গে নি—

গহ্বর শুধু গভীর থেকে গভীরতর হল।

এধারে তাঁদের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছিল। কার্টার শেষবার সমস্ত উত্তম সংহত করলেন। সমস্ত শ্মশানক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করে, তিনি দেখলেন যে, যেখানে ষষ্ঠ রামেসিসের কবর ছিল, তারই কাছে, প্রাচীনকালের বহু কুঁড়ে ঘরের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। এই কুঁড়েঘরগুলোর তলাতেই আছে, টুটেন-খামেনের কবর! নতুবা সত্যিই সে কবর এখানে নেই!

১৯২৩ সালের ১লা নভেম্বর আবার সেখানে চারিদিক থেকে লোহার শব্দ উঠতে লাগল। ৪ঠা নভেম্বর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, প্রতিদিনের নিয়ম-অনুযায়ী খনন-স্থলে আসতেই দেখেন, হঠাৎ সবাই কাজ বন্ধ করেছে—চারিদিক নিস্তব্ধ। একজন লোক হাঁফাতে হাঁফাতে এসে জানাল—প্রথম কুঁড়েঘরটার তলায় একটা পাথরের সিঁড়ি দেখা গিয়েছে।

সিঁড়ি কি একটা ধাপেই শেষ হয়?

সারাদিন অবিশ্রাম খোঁড়ার পর থাকের পর থাক বারোটি ধাপ বেরুল। পরের দিন সূর্য্যোদয়ের পর আবার খোঁড়া আরম্ভ হল। কিছুক্ষণ পরেই সিঁড়ির শেষে দেখা দিল দরজা, নিশ্চয়ই কোন কবর, হয়ত সেই কবর!

এগিয়ে গিয়ে কার্টার দেখেন, দরজায় শীল-মোহর দেওয়া। নবম রামেসিসের শীল-মোহর! অন্ততঃ এই তিন হাজার বছরের মধ্যে এর ভিতর কোনও দস্যু ঢোকেনি। যদি ঢুকে থাকে তো নবম রামেসিসের রাজত্বের পূর্ব্বে। (খ্রীঃ পূর্ব্ব ১১২৫)

দরজায় একটা গর্ত্ত করে ভিতরে টর্চ্চ-লাইট ফেলে দেখলেন যে,

সামনেটা বড় বড় পাথরে ভরাট। তিনি বুঝলেন যে নবম রামেসিসের লোকেরাই কবরটিকে রক্ষা করবার জন্য সেই সব পাথর ঐ ভাবে রেখেছে। ঐ সব পাথরের ওপারে কি আছে ?

বাইরে তখন রাত্রি। সযত্নে ছিদ্রটি বন্ধ করে, কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে প্রহরী দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি বাড়ী ফিরলেন। মানব-হীন মরুভূমিতে চন্দ্রোদয় হয়েছে তখন।

রাত্রিতে বাড়ী ফিরলেন। ষোল বছরের সাধনা কি সফল হল তবে ?

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর মনে আর একটি কথার উদয় হল। কালই সূর্য্যোদয়ে তিনি একা এই নতুন আবিষ্কারের সমস্ত গৌরব এবং আনন্দ উপভোগ করতে পারেন কিন্তু লর্ড কারনারভনকে বাদ দিয়ে একা এই গৌরব অর্জ্জন করলে তাঁর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হবে। লর্ড কারনারভন তখন ইংলণ্ডে।

ষোল বছর অসাধ্য-সাধন করে যে রহস্য-পুরীর প্রবেশ-দ্বারের সন্ধান পাওয়া গেল, সেই দ্বার তেমনি অবরুদ্ধ রেখে তিনি লর্ড কারনারভনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। টুটেন্-খামেনের কবর আবিষ্কার করার গৌরবের চেয়ে এ মহত্ত্ব কম বাঞ্ছনীয় নয়।

পরের দিন ভোরবেলাই কার্টার লর্ড কারনারভনকে টেলিগ্রাফ করলেন। টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র লর্ড কারনারভন মিশরে চলে এলেন।

মিশরের রাজ-প্রতিনিধিদের সামনে প্রথম দরজা খোলা হল। তারপর একটির পর একটি করে সেই সব পাথর সরান হল। পাথর

হাওয়ার্ড কার্টার ষোলবছর অসাধ্য-সাধন করে প্রাচীন মিশরের অপূর্ব ঐশ্বর্য্য আবিষ্কার করলেন।

সরিয়ে ফেলতে আর একটি দরজা দেখা দিল, দরজায় টুটেন্-খামেনের শীল-মোহর !

উল্লাসে কর্ত্তাদের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কম্পিত হস্তে দরজায় একটা গর্ত্ত করলেন। তারপর বহু সতর্কতার সঙ্গে একটা বাতি সেই গর্ত্তের ভিতর দিয়ে ওপারের অন্ধকারের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল।

লর্ড কার্নারভন জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, কার্টার, কি দেখছ ?

বিস্ময়ে তখন কার্টারের কথা বন্ধ হয়ে এসেছিল। তিনি শুধু বল্লেন, অপূর্ব্ব সব জিনিস !

যেখান থেকে সমস্ত আবিষ্কারক বিফল হয়ে ফিরে গিয়েছিল, সেখান থেকে যে-কবর পাওয়া গেল, প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে এত বিস্ময়কর এবং বিচিত্র উপাদান আর কোথাও পাওয়া যায় নি। এত ঐশ্বর্য্য, শিল্প-কলার এত সুন্দর সব নিদর্শন, প্রাচীন মিশরের মাটী থেকে আর বেরোয় নি। অতীত কালের একটা বিরাট মিউজিয়াম হঠাৎ যেন মাটীর ভেতর থেকে পাওয়া গেল। তাই টুটেন্-খামেনের কবর আবিষ্কারের সঙ্গে সারা জগতে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। জগতের এমন কোন কাগজ নেই, যেখানে এই সব জিনিষের ছবি না বেরিয়েছিল।

আসলে যাঁর কবর, তিনি খুব একজন বড় রাজা ছিলেন না। টুটেন্-খামেনের আগে যিনি রাজা ছিলেন, তিনি প্রাচীন মিশরের একজন বিখ্যাত নরপতি। তাঁর নাম হল আখ-এন-আটন্। তিনি মিশরের প্রাচীন দেব-দেবীর পূজা বন্ধ করে দিয়ে এক ঈশ্বরের পূজা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। সেই ঈশ্বরের নাম দিয়েছিলেন "আটন্"।

সূর্য্য হল সেই "আটনের" শক্তির প্রকাশ। টুটেন্‌-খামেন ছিলেন আখ-এন-আটনের জামাই। অতি অল্প বয়সে তিনি মারা যান এবং তাঁর রাজত্বকালে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি।

কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, তাঁর কবরে যে সব জিনিস পাওয়া গিয়েছে, মিশরের আর কোনও রাজার কবরে তা পাওয়া যায় নি।

এক

বার্ণার্ড প্যালিসীর নাম তোমরা বোধ হয় শুনে থাকবে। মাটীর উপর এনামেলের কাজ করার বিদ্যা তিনি ফ্রান্সে প্রথম আবিষ্কার করেন। আজকে তাঁর জীবনের কাহিনী তোমাদের শোনাব।

এখানে তোমাদের দুএকটা কথা আগে থেকে বলে রাখতে চাই। বার্ণার্ড প্যালিসী একজন খুব বড় বৈজ্ঞানিক নন, এমন কি তাঁকে আবিষ্কর্ত্তাও বলা চলে না। তার কারণ, তাঁর বহুপূর্ব্বে এনামেল করার বিদ্যা বহু মানুষ আয়ত্ত করেছিলেন এবং তিনি যে-সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-সময় য়ুরোপে ইটালী এবং জার্ম্মাণীতে এই বিদ্যা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখন যাঁরা এই কাজ করতেন, তাঁরা কাউকেই এই বিদ্যা শেখাতেন না। এমন কি, নিজেদের মধ্যেও, যতদূর সম্ভব, কে কি ভাবে কাজ করে, কে কি জিনিষ ব্যবহার করে, তা গোপন রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরা করতেন। প্যালিসী নিজে চেষ্টা করে এই

বিদ্যা শিখেছিলেন। কিন্তু সে জন্যে প্যালিসীর জীবন আলোচনা করছি না এবং জগতের শ্রেষ্ঠ লোকদের মধ্যে আজও যে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়, তার কারণ এ নয় যে, তিনি ফ্রান্সে সর্ব্বপ্রথম এনামেলের কাজ শিখেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে তিনি যে-ভাবে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, সারাজীবনব্যাপী পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার বিরুদ্ধে যেভাবে সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছিলেন, সেই অপূর্ব্ব আত্মনিয়োগ, সেই জীবনমরণ-পণ সাধনা, সকল রকম বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে সেই মানুষের মত সংগ্রাম করবার শক্তি, তাঁর নামকে জগৎ-বরেণ্য করে রেখেছে। তাঁর জীবন আলোচনায় মনে হয়, কোন নৈরাশ্যই নৈরাশ্য নয়—পথ অতিক্রম করে যাবার পণ সত্যিই যে গ্রহণ করেছে, তার কাছে পথের কোন বাধাই বাধা নয়—যে বলতে পেরেছে অন্ধকারকে বিশ্বাস করি না, সেই পেরেছে শশীসূর্য্য-হীন অন্ধকারে সহস্র দীপ জ্বালিয়ে যেতে। যে চলে, তারই পায়ের তলায় জেগে ওঠে পথ।

বার্ণার্ড প্যালিসীর জীবন সেই পায়ের-তলায় পথকে জাগিয়ে-যাবারই অপূর্ব্ব কাহিনী।

দুই

কোন্ সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার সঠিক তারিখ জানবার আজ আর কোনও উপায় নেই। তবে অনুমান ১৫০৯ কিম্বা ১৫১০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত পেরিগোর্ প্রদেশে প্যালিসী জন্মগ্রহণ করেন। পেরিগোরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য একটু বিচিত্র ধরণের, একদিকে নিত্য-শ্যামল কানন-ভূমি, অন্য দিকে শস্যহীন

তৃণহীন রুক্ষ দীর্ঘ উদাস প্রান্তর—প্যালিসীর জীবনের দুই দিকের যেন দুখানি চিত্র।

তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষেরা একদিন যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য এবং সম্ভ্রমের মধ্যে জীবন-যাপন করে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাদের বংশমর্য্যাদা কতক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ থাকলেও সেই মর্য্যাদা-বোধকে বাঁচিয়ে রাখবার মত ঐশ্বর্য্য তখন আর ছিল না। অল্প টাকায় যাদের অনেকখানি সম্ভ্রম বজায় রেখে চলতে হয়, তাদের নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই সাধারণ লোকে যে-ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারে, প্যালিসী তা' থেকে একটু স্বতন্ত্র হয়ে অর্থোপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার করলেন। সেই সময় ফ্রান্সের ধনী লোকদের মধ্যে কাচের উপর রঙিন্ ছবি আঁকাবার খুব সখ ছিল। প্যালিসী সেই কাজই শিখলেন। ছেলেবেলা থেকে ছবি আঁকার দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। অর্থোপার্জ্জনের জন্যে তাই তিনি স্থির করলেন যে, কাচের উপর ছবি এঁকেই তিনি জীবিকা-নির্ব্বাহ করবেন।

কিন্তু ঘরে বসে এ কাজ করা তখনকার দিনে চলত না। খুব বড় লোক না হলে, এই ধরণের কাজ কেউ একটা বড় করাতেন না। সেইজন্যে সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে হত—কোথায় কোন্ প্রদেশে কোন্ ধনীর ছবি আঁকাবার বাসনা আছে কে বলতে পারে? ঘুরে বেড়াতে প্যালিসীর কোন অনিচ্ছাও ছিল না। ঘুরে বেড়াতে তাঁর ভাল লাগত—নিত্য নতুন পথে, নিত্য নতুন দেশে। পথের ধারে প্রত্যেক তৃণফুলটি, গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রত্যেক প্রাণীটি তাঁর পরিচিত ছিল। তিনি

প্রকৃতিকে ভালবাসতেন—প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গ; প্রত্যেক রূপের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে তিনি রীতিমত ব্যাকুলতা অনুভব করতেন। এতখানি মন দিয়ে যাকে চাওয়া যায়, তাকে পাওয়াও যায়। প্যালিসী প্রকৃতিকে জানতে চেয়েছিলেন। ফ্রান্সের প্রকৃতি তাই তার সমস্ত রহস্য সেদিন এই লোকটির সামনে আপনা থেকে যেন উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিল। প্যালিসী যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি ছিলেন ফ্রান্সের সব চেয়ে বড় প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ; গাছ-পালা, ফল-ফুল, পশু-পক্ষী সম্বন্ধে তাঁর কথা শোনবার জন্যে একসময়ে ফ্রান্সের বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা তাঁর দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই বিদ্যা তিনি বই পড়ে অর্জ্জন করেন নি—যাদের কথা তিনি বলতেন, সেই সব গাছপালা, ফল-ফুল, পশু-পক্ষী, তারাই তাঁকে শিখিয়েছিল তাদের সম্বন্ধে কি বলতে হবে।

আঠারো বছর বয়সে প্যালিসী ঘর ছেড়ে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। কোথায়ও কোন গির্জ্জের জানালায়, কোথায়ও কোন ধনীর বিলাস-কক্ষে, যখন যেখানে কাজ যোগাড় করতে পারেন, সেইখানে পথ চলতে চলতে থেমে পড়েন। সেখানকার কাজ শেষ হলে আবার অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়। কিছুদিন এইভাবে একরকম চলে যাওয়ার পর দেখা গেল যে, কাজ পাওয়া ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠছে। পঞ্চাশ মাইল গিয়ে যখন শোনা যায় যে সেখানে কোন কাজ পাওয়া যাবে না—তখন সেই পঞ্চাশ মাইল হাঁটবার কষ্টটা আরও বেশী করে লাগে।

প্রায় বার বৎসর এইভাবে কেটে গেল। এই বার বৎসর শুধু

উদরান্ন সংস্থানের জন্যই অতিবাহিত হয় নি। এই বার বৎসর কাল তিনি তন্নতন্ন করে প্রকৃতির অনুশীলন করেছেন—দেখেছেন, নীরবে প্রকৃতির মধ্যে অহরহ কি বিরাট সব ব্যাপার ঘটে চলেছে, একটি ফুলকে ফোটাবার জন্যে সমস্ত অরণ্যব্যাপী সে কি বিরাট আয়োজন, একটি তৃণাঙ্কুরকে রক্ষা করবার জন্যে অরণ্যের সে কি আকুলতা! যে দেখতে জানে সেই দেখতে পায়, এমনি ধারা আমাদের চারিদিকে মূক প্রকৃতির রাজ্যে কত ধৈর্য্য, কত প্রেম, কত ত্যাগ, কত অশ্রু-শিশির-বর্ষণ-অন্তে কত সূর্য্য-কিরণ-উন্মাদনা অহরহ সংঘটিত হচ্ছে। প্রকৃতির প্রত্যেক শ্যাম-পত্রে লেখা, ভয় নাই, ক্ষয় নাই!

প্যালিসী বার বৎসর ধরে সে-ই লেখা পড়েছিলেন। যে-বাণী অরণ্য তার শ্যাম-পত্রে লিখে রেখেছে, তারই প্রতিধ্বনি তাঁর ধমনীতে বেজে উঠত, ভয় নাই, ক্ষয় নাই!

বার বৎসর পরে তিনি স্থির করলেন যে, আর ঘুরে বেড়ান নয়, এবার এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে হবে। স্যাঁতে বলে একটি ছোট্ট সহরে একখানি ছোট্ট বাড়ী করে তিনি বসবাস স্থাপন করলেন। যাযাবর হল গৃহবাসী। যথারীতি বিবাহ করে গৃহলক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে এলেন। প্যালিসী সেদিন কল্পনাও করতে পারতেন না যে, যে-বাড়ী তিনি গড়ে তুললেন, তারই কাঠ ভেঙ্গে একদিন আগুনে পোড়াতে হবে,—যে-নারী সেদিন সানন্দে বধূ-রূপে তাঁর ঘরে এলেন তিনিও সেদিন কল্পনা করতে পারতেন না যে, কি ভয়াবহ দুর্দ্দৈবের সঙ্গে তাঁর জীবন সেদিন সংযুক্ত হয়ে গেল। প্যালিসীর একজন জীবনচরিত লেখক বলেছেন, বিয়ের দিন যদি প্যালিসীর স্ত্রী তাঁর ভবিষ্যৎ

সাংসারিক জীবনের ছবি কোনও রকমে একবার দেখতে পেতেন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই গির্জ্জে থেকে ছুটে পালাতেন।

স্যাঁতেতে কয়েক বছর থাকার পর, প্যালিসী দেখলেন যে, কাজ-কর্ম্ম পাবার আর কোনও উপায় নেই। এ ধারে সংসারে তাঁর দুজন স্থায়ী আগন্তুক এসেছে। নিত্য সংসারে অনটন দেখা দিতে লাগল। প্যালিসী স্থির করলেন যে, অন্য কোনও উপায় অবলম্বন করে উপার্জ্জন বাড়াতে হবে, শুধু ছবি আঁকার উপর নির্ভর করে থাকলে অনশনে মরতে হবে।

এই সময় হঠাৎ কোথা থেকে এনামেল-করা একটা মাটীর পাত্র তাঁর হাতে এল। মাটির উপর সেই এনামেলের কাজ দেখে প্যালিসী চমৎকৃত হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হল, "আমি চিত্রকর। ভগবান আমাকে কিছু ক্ষমতাও দিয়েছেন। নাই বা জানলুম মাটির কাজ, কি করে এনামেল তৈরী করে আমাকে জানতেই হবে।" এই সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখে গিয়েছেন, "অন্ধকারে লোকে যেমন পথ হাতড়ে বেড়ায়, তেমনি ধারা আমিও এনামেল কি করে তৈরী করা যেতে পারে তাই খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।"

এখানে মনে রাখতে হবে যে, যে-সময়ের কথা আমরা বলছি, সে-সময় য়ুরোপে প্রকৃত-পক্ষে রসায়ন-বিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করে নি। তখন যে-দেশে যে-লোক যা কিছু জানত, প্রাণপণ চেষ্টা করে তা সংগোপন রাখত। জার্ম্মাণী এবং ইতালীর জনকয়েক কারিকর ছাড়া য়ুরোপে তখন কেউ এনামেলের কাজ জানত না। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিদ্যাকে অত্যন্ত সংগোপনে রাখতেন। রাজা-রাজড়া

যাঁদের এনামেল করাবার সখ হত, তাঁদের সেই কয়েকজনেরই মধ্যে একজনের দ্বারস্থ হতে হত।

প্যালিসী স্থির করলেন যে, যেমন করেই হক এনামেল তৈরী করার পদ্ধতি তিনি বার করবেনই। একবার তার সন্ধান পেলে, তাঁকে আর পায় কে? এনামেলের উপর এমন অপূর্ব্ব সব কাজ তিনি করবেন, যাতে জগৎ বিস্মিত হয়ে যাবে, য়ুরোপের রাজাদের প্রাসাদে প্রাসাদে তাঁর কীর্ত্তি অক্ষয় সৌন্দর্য্য নিয়ে বেঁচে থাকবে।

সমস্ত কাজ ফেলে রেখে প্যালিসী এনামেল তৈরী করবার দিকে মনোনিবেশ করলেন। যত রকমের জিনিষের সংমিশ্রণে এমন পদার্থ পাওয়া যেতে পারে, যা পোড়ালে শক্ত, শাদা আর ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠবে, তাঁর ধারণা মত তাই সংগ্রহ করে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন কড়াতে আগুনের আঁচে চড়ালেন। রাশিকৃত মাটীর পাত্র কিনে নিয়ে এলেন। সেইগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে এক জায়গায় জড়ো করা হল। যত রকম মশলা তৈরী হয়, তার প্রত্যেকটা দিয়ে পরীক্ষা চলতে লাগল। প্যালিসীর নিজের কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, “এ একেবারে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ান!”

ছিলেন চিত্রকর, সমস্ত যৌবন আপনার খেয়ালে ঘুরে বেড়িয়েছেন পথ হতে পথে, হঠাৎ তিনি হলেন বৈজ্ঞানিক, যে বৈজ্ঞানিককে নিজে অনুশীলন করে তথ্য আবিষ্কার করতে হবে। প্রকৃতির রূপ দেখে যে বেড়িয়েছিল, তার মনের গঠন ছিল এক রকম। কিন্তু ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন দ্রব্যের অসংখ্য দ্রব-মূর্ত্তির মধ্যে যাকে আসল বস্তুটি বেছে নিতে হবে—তার সে মানসিক গঠন থাকলে চলে না। একবার

একটু ভুল হয়ে যাওয়া মানে, আবার সমস্ত জিনিস গোড়া থেকে আরম্ভ করা! অতি সামান্য সামান্য ব্যাপারে প্রথম প্রথম এমন সব ভুল হতে লাগল, যা সংশোধন করতে তাঁকে আবার নতুন করে সেই সব পরিশ্রমই করতে হয়েছে। শুধু পরিশ্রম নয়, একবারের ভুল শোধরাতে দুবারের মত খরচ হয়ে গেল, অথচ পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, তাতেও কোন সুফল পাওয়া যায় নি।

এ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখছেন, "প্রথম প্রথম কি ভুলই না করতাম! মশলা তৈরী হলে, বিভিন্ন কড়া থেকে নিয়ে বিভিন্ন পাত্রে লাগিয়ে আগুনে পোড়াতে দিতাম। কিন্তু তখন কোনও রকম বন্দোবস্ত করে পাত্রগুলো আগুনে দেবার কথা মনেই আসত না। কোন্ কড়া থেকে কোন্ মশলা কোন্ পাত্রে দিয়েছি, নিজেরই মনে নেই। সব ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে করি। সারাদিন উনুনের পর উনুন ভাঙছি আর গড়ছি—সারাদিন এটা গুঁড়োচ্ছি, ওটা গুঁড়োচ্ছি, এটার সঙ্গে ওটা মিশিয়ে গরম করে গলিয়ে দেখছি, এমনি করে কখন দেখি একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছি!"

প্রথম প্রথম তাঁর স্ত্রী ভেবেছিলেন যে, প্যালিসী শীগ্‌গিরই হয়ত এমন একটা কিছু তৈরী করে ফেলবেন, যার দ্বারা তাঁদের সমস্ত অভাব অনটন দূর হয়ে যাবে। তাই তিনি স্বামীর কথায় ধৈর্য্য ধরে সেই দরিদ্র অবস্থার মধ্যে পুত্রকন্যাদের আহার থেকে বঞ্চিত করে আগুনে পোড়াবার কাঠ কিনতে দেখে বিশেষ কষ্ট বোধ করেন নি। কিন্তু একমাস গেল, একবছর গেল। দেখতে দেখতে বছরের পর বছর চলে

যেতে লাগল, এ কোন্ উম্মাদ! দিনের পর দিন, বিরাম নেই, বিচ্ছেদ নেই, সেই উনুনের পর উনুন জ্বেলে জিনিসের পর জিনিস মিশিয়ে চলেছে! ছেলেদের দুবেলা পেট পূরে খাবার জোটে না, অথচ মার মন কি করে সহ্য করে, আগুনে পোড়াবার জন্যে কাঠ কেনা হচ্ছে!

ক্রমশঃ কাঠ কেনবার সামর্থ্য একেবারে চলে গেল। ছ' মাইল দূরে একটা কুমোরবাড়ী আছে। যৎসামান্য কিছু দিলে তারা তাদের উনুন ব্যবহার করতে দিতে পারে। প্যালিসী জিনিসপত্র যা ছিল একে একে বন্ধক দিতে লাগলেন। এক সঙ্গে তিনশো, চারশো পাত্র তৈরী করে কুমোরবাড়ীতে পাঠাতে লাগলেন। এক একবার করে বোঝা পাঠান, আর সারারাত জেগে বসে থাকেন, ভাবেন, কালই হয়ত দেখতে পাব, একটা পাত্রের গায়ে এনামেল লেগেছে, শাদা, শক্ত, চক্‌চকে! সারারাত বুক আশায় আশঙ্কায় কাঁপতে থাকে। রাত্রে প্যালিসী ঘুমোতে পারেন না। কিন্তু সকালে গিয়ে দেখেন, যা প্রত্যহ দেখছেন, আজও তাই। কোথায় এনামেলের সে রূপ!

এধারে সংসারের অবস্থা এ রকম শোচনীয় হয়ে উঠল যে, প্যালিসী বাধ্য হয়ে কিছুদিনের মত এনামেল তৈরী করা ছেড়ে দিয়ে আবার ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন। হাতে যৎ-সামান্য পয়সা যেই এল, অমনি আবার সুরু হল সেই উনুন তৈরী করা আর কাঠের আঁচে সারা দিনরাত ফুটন্ত কড়ার দিকে চেয়ে থাকা।

প্যালিসীর ধারণা হয়েছিল যে, যতখানি উত্তাপের প্রয়োজন, তাঁর উনুনে ততখানি উত্তাপ তৈরী করতে তিনি পারেন নি। আবার নতুন করে সব মশলা কেনা হল। যেখান থেকে শেষ করা হয়েছিল

আবার সেখান থেকে আরম্ভ করা হল। তিন ডজন মাটির পাত্র কিনে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভেঙ্গে আবার তাতে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে তৈরী মশলা মাখান হল। এবার কিন্তু তিনি নিজে সেগুলো পুড়োবার চেষ্টা না করে, এক কাচ-ওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন। কাচওয়ালাদের উনুনের আঁচ খুব বেশী—সেই জন্যে সেইখানেই বন্দোবস্ত করলেন।

আবার সেই উৎসুক আশঙ্কায় অপেক্ষা করে থাকা—আবার সেই তন্দ্রাহীন রজনী জেগে শুধু ভাবা, মাটির গায়ে সেই শক্ত শাদা চক্‌চকে জিনিসটা এবার বোধ হয় ধরা দিয়েছে—

এবার যখন ভাঙ্গা পাত্রগুলো ফিরে এল, দেখেন দুএকটার গায়ে একটু একটু শক্ত মত কি যেন লেগেছে! সেইটুকুতেই প্যালিসী আনন্দ-উৎফুল্ল হয়ে স্ত্রীকে জানালেন, আর ভয় নেই, এবার বুঝি দুর্দ্দিন কেটে গেল!

এরই মধ্যে দুটি ছেলে মারা গিয়েছিল—অসুখে উপযুক্ত পথ্যও পায় নি। প্যালিসীর স্ত্রী মুখ বুঁজে সমস্ত সহ্য করে চলেছিলেন। স্বামীর উল্লাস দেখে তিনি আরও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, তাঁর মনে হল এ তাঁর উন্মাদ হবার সূচনা!

হলও তাই। প্যালিসী আর বাড়ী থাকেন না। সেই কাচ-ওয়ালার উনুনের ধারেই ঘুরে বেড়ান। এইরকম ভাবে আরও এক বছর কেটে গেল। এক বছর ধরে আবার দিনের পর দিন সেই পরীক্ষা চলল। কিন্তু তবুও কিছু হল না। অসহায় স্ত্রী পুত্র-কন্যা নিয়ে তখন কান্নাকাটি আরম্ভ করেছেন; ঘরে এক কণা খাদ্য নেই, এধারে একি উন্মাদনা!

স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে তিনি বল্লেন, এই শেষ বার।

কোন রকমে কিছু টাকা ধার করে তিনশ রকমের বিভিন্ন মশলা তৈরী করে তিনি কাচওয়ালার কারখানায় উপস্থিত হলেন। পর্য্যায়-ক্রমে সেই তিনশ পাত্র আঁচে দিয়ে এক দৃষ্টিতে আগুনের দিকে চেয়ে রইলেন। আহার-নিদ্রা সমস্তই ত্যাগ করলেন।

একটার পর একটা পাত্র আগুন থেকে তোলেন, ঠাণ্ডা করেন, দেখেন মশলা গলে গায়ে লেগেছে কিনা! হঠাৎ একটাতে দেখলেন, মশলা পূরোপূরি গলে গিয়েছে। অতি সন্তর্পণে ঠাণ্ডা করে দেখেন, সমস্ত পাত্রের গায়ে সেগুলো শক্ত হয়ে লেগে গেল। তখন তাঁর দাঁড়াবার শক্তি নেই। সেই অবস্থাতেই বাড়ী ছুটে এসে স্ত্রীকে দেখালেন, আর ভয় নেই।

কিন্তু ওধারে কাচওয়ালার উনুন বন্ধ হয়ে গেল। প্যালিসী স্থির করলেন নিজের বাড়ীতে তিনি বড় উনুন তৈরী করবেন। কিছু দূরে একগ্রামে একটা ইঁটখোলা ছিল। সেখান থেকে নিজে ঘাড়ে করে করে ইঁট বয়ে নিয়ে এলেন। বাড়ীর একধারে বিরাট উনুন তৈরী হল।

এত বড় উনুনের উপযুক্ত আঁচ তৈরী করতে হলে যে পরিমাণ কাঠ দরকার, তা কেনবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। লোকে আর ধার দিতেও নারাজ। বহু কষ্টে আবার কিছু ধার করে কাঠ কিনলেন। বাড়ীর একধারেই উনুন তৈরী হয়েছিল—তিনি সেখান থেকে আর নড়লেন না। এক দিন, দু'দিন, তিন দিন চলে গেল। কই, আর তো মশলা গলে না! তবে কি এত বৎসরের এই অসাধ্যসাধনের পরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে?

কিন্তু কাঠ আর মেলে না। নাই বা মিলল। ঘরের আসবাব-পত্রে তো অনেক কাঠ আছে! উন্মাদ বাড়ীর দরজা জানালা ভেঙ্গে উনুনে ফেলতে লাগল। স্ত্রী আর থাকতে পারলেন না। উন্মাদিনীর মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রতিবেশীদের ডেকে তিনি জানালেন, প্যালিসী পাগল হয়ে গিয়েছে, দরজা জানালা, সব আগুনে পোড়াচ্ছে!

গ্রামের চারদিক থেকে মজা দেখবার জন্যে লোকে প্যালিসীর বাড়ীতে এসে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। ছেলে-বুড়ো সকলে পাগল বলে তাঁকে ক্ষ্যাপাতে আরম্ভ করল। নিজের স্ত্রীও তাঁকে উন্মাদ বিবেচনা করে বাধা দিতে লাগলেন। উন্মাদ সব কথা নীরবে শোনেন, —আর শুধু চেয়ে থাকেন, আগুনের আঁচ নিভে আসে কি না!

কাঠ ফুরিয়ে গেলে বিছানা মাদুর যা হাতের কাছে পান, তাই আগুনে সমর্পণ করতে আরম্ভ করলেন। যারা টাকা পেত, প্যালিসী পাগল হয়ে গেছে শুনে বাড়ী এসে তাঁকে গালাগাল দিয়ে যেতে লাগল। কেউ কেউ এমন কথাও শুনিয়ে গেল, বদমায়েসী করে পাগল সেজেছে।

প্যালিসী কারুর কথাতেই কান দেন না। শরীর তাঁর কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে। কি হবে শরীরে, যদি সাধনার ধন না মেলে? ছেলেমেয়েদের মুখ দেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কি হবে সংসারের মায়ায়, যদি মন যায় মরে? পোষাক-পরিচ্ছদ যা ছিল, সমস্ত বিক্রী করে ফেলেছেন। সামান্য একটি জীর্ণ পরিচ্ছদে দিন চলে যায়। কি হবে পরিচ্ছদে যদি জীবনই হয়ে যায় ব্যর্থ? লোকে উপহাস করে, গালাগাল দেয়। কি হবে লোকের প্রশংসায় যখন জীবনের চরমক্ষণে কেউ একবার পাশে এসে দাঁড়ায়ও না। জীবনের শ্রেষ্ঠ

মুহূর্ত্ত তো এমনি নিঃসঙ্গ। উন্মাদের শুধু এক চিন্তা, আগুনের শিখা না নিভে যায়!

যুগে যুগে এই তপস্যাই মাটীর পৃথিবীকে স্বর্গের মহিমা দান করেছে।

একদিন বাইরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। কোনও রকমে একটা কাঠের ভাঙ্গা জানালা বন্ধ করে প্যালিসীর স্ত্রী পুত্র-কন্যাদের নিয়ে ঝড়-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে আছেন। হঠাৎ দেখেন, অন্ধকারে ভূতের মতন কে এসে, দুটো শীর্ণ হাত বাড়িয়ে সেই জানালাটাও খুলে নিয়ে গেল, উন্মাদ ঝড়ো-হাওয়া ঘরকে দুলিয়ে দিয়ে গেল। প্যালিসীর স্ত্রী আর্ত্তনাদ করে উঠলেন।

কে জানত সেদিন ফ্রান্সের এক নগণ্য শহরে এই যে তপস্বী এই ভাবে ষোল বৎসর ধরে তপস্যা করছিলেন সেই ষোল বৎসরের প্রত্যেক দিনটি সত্য!

কোন দিন কোন তপস্যা ব্যর্থ যায় না। প্যালিসীর তপস্যাও ব্যর্থ হয় নি। ষোল বৎসর পরে তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলেন। এনামেলের উপর তাঁর অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখে দেশ-দেশান্তরে তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ল। রাজারা সমাদর করে রাজপ্রাসাদে ডেকে নিয়ে তাঁকে কাজের ভার দিতে লাগলেন! জ্ঞানীরা তাঁর মুখে বিজ্ঞান-কথা শোনবার জন্যে দূর দূরান্তর থেকে সমবেত হতে লাগলেন। মান, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য অজস্র ধারায় আসতে লাগল।

দীর্ঘ ঊন-আশী বৎসর কাল তিনি জীবিত ছিলেন। পর পর প্রথম ফ্রান্‌সিস্, দ্বিতীয় হেনরী, নবম চার্লস্‌কে তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনে

বসতে দেখেছেন। প্রত্যেক রাজা-ই তাঁকে ভালবাসতেন। প্যালিসীর বেঁচে থাকবার পক্ষে রাজাদের এই অনুগ্রহের একান্ত প্রয়োজন ছিল। তার কারণ ফ্রান্সে তখন স্বাধীন ধর্ম্ম-মতের জন্যে মানুষকে জীবন-দান পর্য্যন্ত করতে হত! রাজা যে-ধর্ম্মের অনুমোদন করেন, সে-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত যাঁরা পোষণ করতেন তাঁদের মৃত্যুদণ্ড হত। কোনও বিচার নেই, কোনও বিতর্ক নেই, হয় রাজ-অনুমোদিত ধর্ম্ম স্বীকার করতে হবে, নয় মৃত্যু-দণ্ডকে বরণ করতে হবে।

প্যালিসী রাজ-অনুমোদিত ধর্ম্মে বিশ্বাস করতেন না। মানুষ তার ধর্ম্ম-মতের জন্য কারুর কাছে দায়ী নয়। কারুর কোনও ক্ষমতা নেই, মৃত্যু-দণ্ড দেখিয়ে বা অন্য কোনও ভয় দেখিয়ে, ধর্ম্মের স্বাভাবিক গতিকে বাধা দেবার। সেই যুগে প্যালিসীর ছিল এই মত। কিন্তু তবু যখনই তাঁর জীবনের উপর আক্রমণ হয়েছে, রাজ-অনুগ্রহে তিনি রক্ষা পেয়ে এসেছিলেন। প্রত্যেক রাজাই তাঁকে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করবার জন্যে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি কারুরই অনুরোধ রক্ষা করেন নি।

নবম চার্লসের পর তৃতীয় হেনরী ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। প্যালিসীর তখন ৭৬ বৎসর বয়স। বার্দ্ধক্যে শরীর নুয়ে পড়েছে। সেই সময় একদিন সহসা রাজার সৈন্যেরা এসে তাঁকে বন্দী করে ধরে নিয়ে গেল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে তিনি প্রচার করেন।

তৃতীয় হেনরী তাঁকে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করতে অনুরোধ করলেন। ছিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধ সেই অনুরোধ উপেক্ষা করে অন্ধকার বায়ুহীন ভূ-গর্ভের কারাগারে প্রবেশ করলেন।
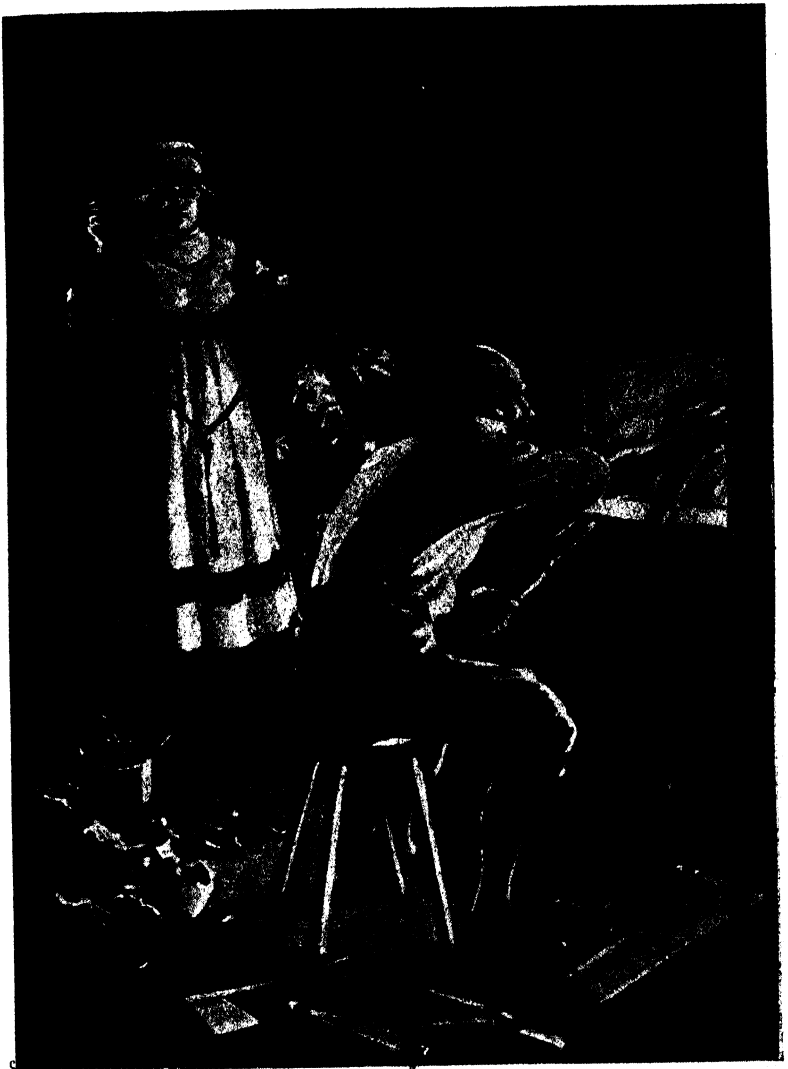
বার্ণার্ড প্যালিসী অন্ধকারে তাঁরই ঘরে ঢুকিয়া
জানালা ভাঙ্গিয়া নিয়া গেলেন।

দু' বছর পরে রাজা তৃতীয় হেনরী একদা সেই কারাগারে উপস্থিত হয়ে বৃদ্ধকে আবার মত পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ কারান্ধকারে দাঁড়িয়ে সে অনুরোধ উপেক্ষা করলেন। দুঃখিত হয়ে তৃতীয় হেনরী সেদিন বলেছিলেন, "আপনার জন্যে আমার দয়া হয়। ৪৫ বৎসর ধরে আপনি আমাদের কাজ করে এসেছেন। আমার আগে যাঁরা সিংহাসনে বসেছিলেন, তাঁরা আপনাকে আগলে থেকে নির্য্যাতিত হতে দেন নি। কিন্তু আমি আর পারছি না। পাত্র-মিত্রদের দ্বারা বাধ্য হয়ে আমি শেষবার আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি, মত পরিবর্ত্তন না করলে, আপনাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে!"

ফ্রান্সের সেই রাজার দিকে একবার চেয়ে তাপস-শ্রেষ্ঠ সেদিন সেই কারাগারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "আপনার যা দণ্ড দেবার, আপনি তা দিন্। শুধু এই কথা বলবেন না যে, আমার জন্য আপনার অনুকম্পা বোধ হচ্ছে। আমি জগতে কারুর অনুকম্পার পাত্র নই। তার বদলে শুনে যান, আমিই আপনাকে অনুকম্পা করি, যে রাজা হয়ে একজন বন্দীর কাছে এসে বলে, আমি পাত্রমিত্রদের দ্বারা বাধ্য হয়ে এই কাজ করছি!"

তৃতীয় হেনরী ফিরে গেলেন।

প্যালিসী সেই অন্ধকার কারা-কক্ষেই রইলেন। তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবার আদেশ তৃতীয় হেনরীকে আর দিতে হয় নি, কারণ তার পূর্ব্বেই সেই অন্ধকার কারাকক্ষে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

এই তপস্বীর জন্ম-ভূমি বলে, ফ্রান্সের ছেলে-মেয়েরা আজ নিজেদের ধন্য মনে করে, মনে করে তারা ধন্য,—যারা সেই মাটীতে জন্মেছে, যে মাটীতে একদিন প্যালিসী জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পুরাণে আমরা পড়েছি, ভগীরথ নিজের তপস্যার বলে স্বর্গ থেকে মন্দাকিনীর ধারাকে মর্ত্ত্যে এনে মৃত সগর-সন্তানদের ভস্মীভূত দেহে প্রাণ এনেছিলেন। পুরাণের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পুরাণের সেই আদিম মানুষগুলি এখনো নানা ছদ্মবেশে এই পৃথিবীতে মাঝে মাঝে জন্মগ্রহণ করেন। দূর তুরস্কে এমনি একটী লোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কামাল আতাতুর্ক নামে তিনি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকে চিহ্নিত করে রেখে গিয়েছেন।

স্যালোনিকার এক নগর-প্রান্তে সামান্য দরিদ্র সংসারে কামাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আলী রেজা, মাতার নাম জোবেদা।

স্যালোনিকার বন্দরের অফিসে আলী রেজা সামান্য কেরাণীর কাজ করতেন। তাও প্রত্যেক মাসে নিয়মিত মাইনে পেতেন না। কারণ তখন তুরস্কের সুলতানের কু-শাসনের ফলে সরকারী দফ্‌তরখানা পর্য্যন্ত ভাঙ্গ-ভাঙ্গ অবস্থায় ছিল।

নয় বৎসর বয়সে কামাল হইলেন পিতৃহীন। পিতা আলী রেজা ছিলেন দরিদ্র। মৃত্যুর সময় স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই কিছুই। মাতা জোবেদা অনন্যোপায় হইয়া স্বামীর আবাস-স্থল স্যালোনিকা পরিত্যাগ করিয়া শহরের নিকটবর্ত্তী লাঙ্গাসান নামক গ্রামে তাহার এক ভাইয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। এইখানে কামালকে আস্তাবল পরিষ্কার, পশুর খাদ্যপ্রদান, মেষ চরানো প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইত। ইহার দুই বৎসর পর জোবেদা অনেক চেষ্টার পর তাহার এক ভগ্নীর অর্থসাহায্যে কামালকে আবার স্যালোনিকার এক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

কামাল পাশার জনৈক জার্ম্মাণ জীবনী-লেখক কামাল পাশার আত্মজীবনীর সামান্য অংশবিশেষ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি (কামাল পাশা) বলেন:

"বাল্যের একটা মাত্র অভিজ্ঞতা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেটা হলো এই: লেখাপড়ার বয়স যখন হলো, তখন আমার পিতা-মাতা মহা ফাঁপরে পড়লেন আমাকে কোন্ জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঠাবেন তাই নিয়ে। মাতা সেকেলে ধরণের—চিরাচরিত সামাজিক ও ধর্ম্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ধার্ম্মিকতা এবং মামুলী ধরণের জীবনসুলভ শান্তি ও আত্মপ্রসাদ তাঁর জীবনের মস্তবড় সম্পদ। ধর্ম্মানুষ্ঠানে অন্ধবিশ্বাস ও অচলা ভক্তি তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তাঁকে নড়াতে পারে জগতে এমন শক্তি নেই। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমাকে হোজাদের পরিচালিত কোন একটা শরীয়তপন্থী মাদ্রাসায় ভর্ত্তি করাবেন। তিনি মনে করতেন, প্রত্যেক তুর্কী বালকের জীবনে

একটা শুভ মুহূর্ত্তের আগমন সুনিশ্চিত। সেই শুভ-মুহূর্ত্তে প্রত্যেক বালক মনে করবে যে মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনের বন্ধন শিথিল হয়ে আসে, আর বৃহত্তর ধর্ম্ম-জগতের সঙ্গে বন্ধন ক্রমেই দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর হ'তে থাকে।

"কিন্তু আমার পিতার সঙ্গে আমার মাতার মতের অমিল ছিল এইখানে। পিতা ছিলেন আধুনিকতার পক্ষপাতী, উদারনৈতিক শ্রেণীর লোক। পাশ্চাত্যের নূতন চিন্তাধারার সঙ্গে ছিল তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি। কাজেই তাঁর ইচ্ছা ছিল, আমাকে কোন একটা ব্যবহারিক শিক্ষায়তনে ভর্ত্তি করান।

"পরিণামে পিতার ইচ্ছাই জয়ী হলো। কিন্তু এ নিয়ে মাতার সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ হয়নি। একটু চালাকি ক'রে তিনি কাজ হাসিল করেন। আপাততঃ তিনি মাতার কথামতো আমাকে ফাতমঃ মোল্লাস্কুলে ভর্ত্তি করেন ; স্কুলে ভর্ত্তি করবার সময় যে-ধর্ম্মানুষ্ঠান পালন করতে হয় তাও আমি করি। যেদিন আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করানো হবে, সেদিন ভোরে মাতা আমাকে খুব জমকালো সাদাপোষাকে বিয়ের বরযাত্রীরূপে সজ্জিত করেন। মাথায় একটা সোণালী কাজ-করা লম্বা চাদর পাগড়ীর মতো বেঁধে দেওয়া হয়। আমার হাতে ছিল একটা গিল্‌টী-করা সবুজ গাছের ডাল। তখন একজন হোজা শিক্ষক তাঁর দল-বল নিয়ে আমাদের বাড়ীর দরজার সামনে আসেন। দরজা খুব সুন্দরভাবে সবুজ লতাপাতায় সাজানো হয়েছিল। তখন একটা দোয়া পড়া হয়। তারপর আমি মাতা-পিতা ও উপস্থিত শিক্ষককে সালাম করি এক অদ্ভুত কায়দায়, আমার আঙ্গুলের অগ্রভাগ

বুকের উপর একবার তুলি, আবার একবার কপালে তুলি এবং তাহাদের হাতে চুমো খাই। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হ'লে আমরা এক লম্বা মিছিল করে শহরের রাস্তা ঘুরে ঘুরে মসজিদের সংলগ্ন মাদ্রাসায় যাই। আমার সমপাঠীরা তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে কত যে হর্ষধ্বনি করছিল!

"মাদ্রাসা-গৃহে প্রবেশ করার পর সকলে মিলে সমস্বরে পাঠ করি। তারপর শিক্ষক মহোদয় আমাকে হাত ধরে নিয়ে যান একটা উন্মুক্ত কক্ষে। আমার সামনে তখন ভেসে উঠলো পবিত্র কোরাণ-শরীফের একটা শব্দ।

"এর ছয় মাস পর, যতদূর মনে পড়ে, আমার পিতা আমাকে সেই স্কুল হ'তে সরিয়ে আনেন। সমনী এফেন্দী পূরা য়ুরোপীয় স্টাইলে একটা প্রাইভেট স্কুল চালাতেন। আমি সে-স্কুলে ভর্ত্তি হই। আমার মাতার এতে খুব আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁর ইচ্ছামতো আমাকে প্রথমতঃ মাদ্রাসায় ভর্ত্তি করানো হয়েছিল এবং সেখানে চিরাচরিত নিয়মে ধর্ম্মানুষ্ঠানও পালন করা হয়েছিল!"

কামালের এই উক্তি হতে তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবনের আভাস পাওয়া যায়। গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী মনের সূচনা পাওয়া যায় এ-সব ছোটখাটো ব্যাপারে।

কামালের জীবনে আবার সুখের বাতাস বহিল। কিন্তু এ-সুখ তাঁহার বেশীদিন সহিল না। ক্লাশের ছাত্রদের সঙ্গে একদিন তাঁহার ঝগড়া হয়। এ-ঝগড়াতে তাহার দোষ ছিল না। কিন্তু শিক্ষক তাঁহাকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। কামাল ইহার প্রতিবাদ করায়

শিক্ষক ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে ভীষণ প্রহার করেন। কামাল তখন একাদশ বৎসরের বালক মাত্র। পিতৃহীন। নিঃস্ব জননী ছাড়া পৃথিবীতে আপন বলিতে কেহ নাই। তবু কামাল শিক্ষকের এ অন্যায় অত্যাচার নত মস্তকে গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে তিনিও শিক্ষককে প্রতিআঘাত করিলেন এবং সেই যে স্কুল পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, সেই স্কুলে আর কিছুতেই ফিরিয়া গেলেন না। এইখানে আমরা কামালের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ দেখিতে পাই—বিপ্লবী কামালের অগ্নিময় জীবনের প্রথম স্ফুলিঙ্গস্ফুরণের সন্ধান পাই।

মাতার ইচ্ছা ছিল কামাল হোজা বা ধর্ম্মযাজক হউক। কিন্তু কামালের এ-জীবন পছন্দ হইল না। স্যালোনিকার সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন পোষাক পরিধান করিয়া মার্চ্চ করিয়া চলিত, কামাল সকল ভুলিয়া সেদিকে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি হইবেন সৈনিক, তিনি হইবেন সেনাপতি—মানুষের নেতা, মানুষের পরিচালক। কিন্তু পুত্রের এ-আকাঙ্ক্ষা মাতার মনঃপুত হইল না। একটী মাত্র পুত্রকে সামরিক জীবনের বিপদসঙ্কুল পথে তিনি ঠেলিয়া দিতে পারেন না। কামাল আবার বিদ্রোহ করিলেন। মাতা কোনরূপ বাধাদানের সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই তিনি গোপনে সামরিক বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিলেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া গেলেন।

কামাল এইখানে জীবনের প্রকৃত আস্বাদ পাইলেন—এইখান হইতেই তাঁহার নবজীবন আরম্ভ হইল। শীঘ্রই তিনি ক্লাশে সর্ব্বোচ্চ

স্থান অধিকার করিলেন। অঙ্কে ও সামরিক বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা এত অসাধারণ ছিল যে, দ্বিতীয় বর্ষ হইতে নিজ ক্লাশে অধ্যয়ন ব্যতীত উক্ত বিষয়ে নিম্নশ্রেণীতে তিনি অধ্যাপনাও করিতেন।

১৭ বৎসর বয়সে স্যালোনিকা সামরিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় অতি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে মনাস্তিরের উচ্চ সামরিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

এই সময় মনাস্তির যুদ্ধযাত্রী সেনাবাহিনীর মার্চ্চের তালে তালে ও কামানের গর্জ্জনে মুখরিত। গ্রীস ক্রীটদ্বীপ দখল করিয়াছে। তুরস্ক যুদ্ধঘোষণা করিয়া সমরক্ষেত্রে দ্রুত সেনাপ্রেরণ করিতেছে।

সারাদেশ ব্যাপিয়া তখন নানারূপ গোলযোগ ও বিবাদ-বিসম্বাদের ঝড় বহিয়া চলিয়াছে—যুদ্ধ আর যুদ্ধের গুঞ্জবে সমগ্র দেশ অনুরণিত। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের তখন নাভিশ্বাস উপস্থিত। ইউরোপের খৃষ্টান শক্তিবর্গ এই আসন্ন মৃত্যু-যাত্রী মুসলিম সাম্রাজ্যের দেহ ঘেরিয়া বসিয়া আছে—প্রত্যেকেই তাহার একটা বিরাট অংশ ছিন্ন করিয়া লওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

শুধু বাহির হইতে নয়, অন্তর্বিপ্লবেও তখন এই সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। ষোড়শ শতাব্দীতে ওসমানীয় সম্রাটদের গৌরবের দিনে সুলতানকে কেন্দ্র করিয়া যেরূপ শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, দেশের শাসন-প্রণালী তখনও তেমনি আছে। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে তখন তাহা যুগজীর্ণ—নিষ্ফল, কলুষ-কলঙ্কিত। সর্ব্বত্রই দারিদ্র্য ও অসন্তোষ। যুবকেরা শাসনসংস্কার চাহিতেছে।

ইউরোপে Red fox বা লোহিত শৃগাল নামে পরিচিত নিষ্ঠুর ও

ধূর্ত্ত সুলতান আবদুল হামিদ তখন তুরস্কের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি নিজের প্রজা ও বৈদেশিক—সকলকেই সমান ভয় করিতেন। কোন নূতন চিন্তাধারাকেই তিনি দেশে বিস্তারলাভ করিতে দিতেন না। সকল প্রকার শাসন-সংস্কারেরই তিনি ছিলেন বিরুদ্ধে। সমগ্র সাম্রাজ্য তিনি গোয়েন্দা দ্বারা এমনই ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, যেখানেই তিনটা লোক একত্রে কথা বলিত, সেখানেই একটা গোয়েন্দা তাহাদের আলাপ আড়ি পাতিয়া শুনিয়া গুপ্ত পুলিশের নিকট রিপোর্ট করিত। কোনরূপ স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত নিরাপত্য দেশের কোথাও ছিল না। দেশ-প্রেমিক তুর্কীদের দ্বারা কারাগারসমূহ তখন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেশের আকাশ-বাতাস তখন বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বহ্নি-বাষ্পে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ মনাস্তিরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বল্কান প্রদেশে বিপ্লবাগ্নি যে-কোন মুহূর্ত্তে প্রজ্বলিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সুলতানের বিরোধিতা সত্ত্বেও নবনব ভাবধারা জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছিল।

যুবক কামাল যৌবন-সুলভ উদগ্র আগ্রহ নিয়া এই নূতন চিন্তাধারায় দীক্ষা নিলেন। অন্তরে অন্তরে তিনি ছিলেন বিপ্লবী, কর্ত্তৃত্ব তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না—তাহা সুলতানেরই হউক, কিংবা অন্য যাহারই হউক।

ছুটীর সময় যখন তিনি স্যালোনিকায় থাকিতেন, তখন তথাকার কয়েকজন ফরাসী সন্ন্যাসীর নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষায়ই তিনি অধিক সময় ব্যয় করিতেন। এইখানে তিনি ফেতি নামক একজন

মেসিডোনিয়ান যুবকের বন্ধুত্বলাভ করেন। ফেতি ভাল ফরাসী জানিতেন। দুই বন্ধু মিলিয়া ভল্টেয়ার, রুশো ও অন্যান্য ফরাসী লেখকদের লিখিত সকল প্রকার বিপ্লবাত্মক পুস্তক এবং হব্স্ ও জন্ ষ্টুয়ার্টমিলের রাজনৈতিক ও অর্থনীতি-মূলক পুস্তকাদি অধীর আগ্রহে পাঠ করিতেন। এই সকল পুস্তক তখন তুরস্কে বাজেয়াফ্ত এবং ইহাদের সহিত ধরা পড়িলে কারাবাস সুনিশ্চিত। কিন্তু এই বিপদের সম্ভাবনাই দুই বন্ধুকে এই সকল পুস্তকপাঠে আরও আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিত।

কামাল এই সময় তাহার এই নব-লব্ধ বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারা নিয়া তাহার সহপাঠি ও সামরিক বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ করিলেন ঃ তুরস্ক—তাহাদের তুরস্ককে বৈদেশিক কবল ও সুলতানের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেই হইবে! মুক্তি ও স্বাধীনতা সম্বন্ধেও তিনি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করিতেন এবং তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় অগ্নিময়ী কবিতাও লিখিতেন।

স্যালোনিকা সামরিক বিদ্যালয়ের মত মনাস্তিরের উচ্চ সামরিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষারও সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় তিনি সাব-লেফ্টেনান্ট পদ প্রাপ্ত হন এবং কনস্টান্টিনোপলের জেনারেল ষ্টাফ-কলেজ (সৈনাধ্যক্ষদের শিক্ষালয়) হারবিয়াতে উচ্চতম সামরিক শিক্ষালাভের জন্য প্রেরিত হন।

এই সময় কামালের বয়স ২০ বৎসর। এই জেনারেল ষ্টাফ-কলেজ হইতেও কামাল অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০৫ সনের জানুয়ারী মাসে ক্যাপ্টেন-পদে নিযুক্ত হন।

কনষ্টান্টিনোপলের জেনারেল ষ্টাফ-কলেজে অধ্যয়নকালেও কামাল

তাহার বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দেখিলেন, এখানকার ছাত্রদের সকলেই বিপ্লববাদী। প্রত্যেক তরুণ অফিসারই সুলতানের অত্যাচার ও তুরস্কের শাসন ব্যাপারে বৈদেশিক-দের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।

কলেজের শিক্ষকগণ ও বহু উচ্চ সামরিক কর্ম্মচারী ছাত্রদের এই বিপ্লবাত্মক মনোভাবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে এই সব মতবাদ প্রচার করা কিংবা এই সম্পর্কে ছাত্রদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার সাহস তাঁহাদের ছিল না।

কামাল এই কলেজে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই সেখানে "ওতন" বা "স্বদেশ" নামক একটী বিপ্লব-সমিতি ছিল। সমিতি গোপনে আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান করিত এবং হাতে লেখা একটী পত্রিকা পরিচালনা করিত। পত্রিকাটীর পাঠ শেষ হইলে একজনের নিকট হইতে আর একজনের নিকট হাতে হাতে বিলি হইত। এই পত্রিকাতে তুরস্কের পুরাতন শাসন-প্রথা, সুলতানের অযোগ্য কর্ম্মচারীবৃন্দ ও তাঁহার অত্যাচার সম্বন্ধে প্রবল আক্রমণ থাকিত।

এই সমিতির সদস্যগণকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে, সুলতানের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন-তন্ত্র ভাঙ্গিয়া তৎস্থলে নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন, এবং জনসাধারণকে মোল্লা-পুরোহিতদের হস্ত হইতে এবং নারীদিগকে বোরকা ও হেরেমের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। তুরস্ককে সুলতান ও তাহার গুপ্তচরেরা গলা টিপিয়া ধরিয়াছে—নূতন ভাবধারা যদি তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত না করা যায়, তবে তাহার মৃত্যু অবধারিত।

কামাল এই 'ওতন' দলে যোগদান করিলেন। তাহাদের পত্রিকার জন্য তিনি উত্তেজনামূলক প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সমিতির গুপ্ত আলোচনা-সভাতে তিনি যে-সকল বক্তৃতা দিতেন তাহাতেও প্রচলিত শাসন ও সমাজবিধির বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ আক্রমণ থাকিত।

কলেজের অধ্যক্ষও এই সমিতির কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে সকল সংবাদই জানিতেন, কিন্তু তিনি তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। সুলতানের গোয়েন্দারা এই সমিতির অস্তিত্বের কথা জ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সুলতানকে জানাইল। সুলতান চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি মিলিটারী ট্রেনিংএর ডিরেক্টার জেনারেল ইসমাইল হাক্কি পাশাকে যাহাতে 'ওতন' বন্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। ইসমাইল হাক্কি কলেজের অধ্যক্ষকে এই সমিতির জন্য যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। বাধ্য হইয়া কলেজ-অধ্যক্ষ সমিতির অধিবেশন যাহাতে আর কলেজ-অভ্যন্তরে না হয়, তাহার জন্য সাবধান হইলেন।

কিন্তু ছাত্রগণ কলেজের বাইরে "ওতন" চালাইতে লাগিলেন। তখন "ওতন" আলোচনা-সমিতিরূপে না থাকিয়া কনস্টান্টিনোপলের অন্যান্য শত শত গুপ্ত সমিতির মত আর একটি গুপ্ত সমিতির আকার ধারণ করিল।

কামালের পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবার পরে চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়েক সপ্তাহ সময় তিনি হাতে পাইলেন। এই সময় "ওতন"-পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার তিনি নিজ হাতে গ্রহণ করেন। তিনি এক জন-বিরল রাস্তায় একটি ঘর নিয়া সমিতি ও

পত্রিকার গুপ্ত অফিস স্থাপন করিলেন। বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধবদের গৃহে অথবা কাফিখানার পিছনের কামরায় তিনি সমিতির গোপন সভার আয়োজন করিতেন।

কেহ অনুসরণ করিতেছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সদস্যগণ অতি সাবধানে এই সকল সভায় যোগদান করিতেন।

এই সকল সভার গোপনতা ও বিপদাশঙ্কাই কামালকে উৎসাহ-উদ্দীপিত করিয়া তুলিত। এই সময়ই তিনি বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান-গঠনের কায়দা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন-প্রণালী, নূতন সদস্যদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষার নিয়ম, সাঙ্কেতিক-পত্র, বাক্য ও চিহ্ন বুঝিবার উপায় এবং বৈপ্লবিক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন।

সদস্যগণকে যাহাতে কাগজপত্রের সহিত ধরিতে পারে, সেজন্য পুলিশ সর্ব্বক্ষণই তাহাদের পিছনে লাগিয়া থাকিত। ইহা বিশেষ কঠিন কাজও ছিল না—কারণ তাহারা এ-পথের অনেকটা নূতন পথিক বলিয়া অভিজ্ঞতা-জাত জ্ঞান অপেক্ষা উৎসাহই তাহাদের বেশী ছিল। একজন গোয়েন্দা তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। উক্ত গোয়েন্দার নির্দ্ধারিত সময়ে একজন নূতন সদস্যের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য সমিতির সকল সদস্য একত্রিত হইলে পুলিশ অকস্মাৎ তাহাদের গৃহ অবরোধ করিয়া সকলকে গ্রেফ্‌তার করে।

"ওতনে"র অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কামালও ইস্তাম্বুলের লোহিত কারাগারে (Red Prison) বন্দী হন। তাঁহার মোকদ্দমাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া বিবেচিত হয়। পুলিশ তাঁহার বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ সংগ্রহ করে। তাঁহাকে অন্যান্যের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জ্জন কারাকক্ষে

আবদ্ধ করা হয়। ভবিষ্যৎ তাঁহার অন্ধকারময়। সুলতান যদি তাঁহাকে সাঙ্ঘাতিক লোক বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে হয়ত তাঁহাকে পৃথিবী হইতে বিদায় নিতে হইবে অথবা বহু বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ কিম্বা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। তাহার পূর্ব্বেও বহুলোক এই লোহিত কারাগার হইতে চিরতরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে—জীবনে তাহাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

তাঁহার মাতা ও ভগ্নী স্যালোনিকা হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হইল না। তবে তাঁহারা তাঁহার নিকট কিছু টাকা পাঠাইতে সমর্থ হইলেন।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া কামাল এক স্বল্প-পরিসর অপরিচ্ছন্ন কামরায় আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। দিনের বেলায়ও সে-কামরা অন্ধকারময়। বহুউর্দ্ধে একটি ক্ষুদ্র জানালা দিয়া অতি সামান্য আলো-বাতাস ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিত। দীর্ঘদিন আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহার আত্মা যেন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল। তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ একদিন পূর্ব্বাহ্ণে কিছু না জানাইয়া হঠাৎ তাঁহাকে ইসমাইল হাক্কি পাশার অফিসে নিয়া যাওয়া হইল। কামাল দুইজন সামরিক পুলিশের মধ্যে সোজা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

পাশা তাঁহাকে অনেক প্রকার ভয় দেখাইয়া ও উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন: "মহামান্য সুলতান তোমাকে এবার ক্ষমা করিলেন। তুমি এখনও তরুণ ও নির্ব্বোধ। বোধ হয়, তুমি বাস্তবিক যতখানি খারাপ তাহার চেয়ে অনেকখানি বেশী মাথাগরম। যাহা হউক, তোমাকে

দামাস্কাসে অশ্বারোহী সৈন্যদলে নিয়োগ করা হইল। সেখান হইতে তোমার সম্বন্ধে কি রিপোর্ট পাই তাহার উপরই তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সাবধান, তোমাকে দ্বিতীয়বার ক্ষমা করা হইবে না।"

ঐ রাত্রেই পুলিশ তাঁহাকে এক পাল-দেওয়া সিরিয়াগামী জাহাজে তুলিয়া দেয়। কোন বন্ধুবান্ধব, এমন কি মায়ের সঙ্গেও তাঁহাকে দেখা করিতে দেওয়া হইল না।

দীর্ঘ আশীদিন জাহাজে ভ্রমণ করিয়া তিনি বয়রুতে অবতরণ করেন এবং তথা হইতে অশ্বারোহণে দামাস্কাসে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে গিয়াই দেখিলেন যে দ্রুসদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য তাঁহার বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত। দামাস্কাসের দক্ষিণে লেবানের পার্ব্বত্য অঞ্চলে দ্রুসেরা বাস করে। ইহাদিগকে বিদূরিত করিয়া কামাল তাঁহার বাহিনীসহ দামাস্কাসে ফিরিয়া আসেন।

দামাস্কাসে আসিয়াই তিনি তথায় "ওতন"এর এক শাখা স্থাপনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। নির্জ্জন কারাবাস কিংবা হাকি পাশার ভীতি প্রদর্শন কিছুই তাঁহার অফুরন্ত প্রাণশক্তির কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারে নাই। ভীতও তিনি হন নাই। তিনি ছিলেন যথার্থ বিপ্লবী। যৌবন-সুলভ উদ্যম ও উদ্দীপনা তখনও তাঁহার ছিল। কিন্তু এবার তিনি হইলেন অত্যন্ত সাবধান। লোক-নির্ব্বাচনেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিলেন। তিনি কবিতা ও সাহিত্য রচনা ছাড়িয়া দিলেন। তিনি স্থির করিলেন, সাহিত্য ও কাজ একসঙ্গে চলিতে পারে না। কারণ সাহিত্য কঠোর সঙ্কল্পের

ইচ্ছা ও শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। কাজেই সাহিত্যচর্চ্চাকে পশ্চাতে রাখিয়া তিনি বিপ্লবের সবিস্তার কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ ও সংগঠন-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দেখিলেন, বিপ্লবের জন্য জমি প্রস্তুত হইয়াই আছে। শুধু বীজ বপনের অপেক্ষা। কন্‌ষ্টান্টি-নোপলের মত এখানেও তরুণ অফিসারগণ অসন্তুষ্ট এবং ঊর্দ্ধতন অফিসারগণ তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কামাল এইখানে তাঁহার বিপ্লবকার্য্যে সাহায্যের জন্য মুফিদ লুতফী নামক সামরিক বিদ্যালয়ের তাঁহার একজন পুরাণ সাথী পাইলেন। দ্রুত বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল এবং দেখিতে দেখিতে সিরিয়ার সকল বাহিনীর মধ্যে তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কিন্তু কামাল দেখিলেন, ইহাতেও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দামাস্কাস হইতে বিদ্রোহ আরম্ভ করা। কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ স্থানীয় তুর্কী বাহিনীর অফিসারগণ যদিও বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।

বন্ধুগণ তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইল যে, বর্ত্তমান বিপ্লবের কেন্দ্র হইল বল্‌কানে। সুতরাং তিনি যেন স্যালোনিকায় বদলী হইবার চেষ্টা করেন।

কামাল সঙ্কল্প করিলেন যে, বদলীর অনুমতি পান বা না-ই পান, তিনি স্যালোনিকা যাইবেনই। ঐ সময় সিরিয়ার সীমান্তবর্ত্তী জাফা বন্দরে আহমদ বে নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিও ‘ওতন’ দলের লোক। তিনি কামালকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তদনুসারে কামাল কয়েকদিনের ছুটী নিয়া জাফায় গমন করিলেন।

সেখানে তিনি এক জাল পাসপোর্ট নিয়া এক ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেন এবং সওদাগরের বেশ ধারণ করিয়া মিসরগামী এক জাহাজে আরোহণ করিয়া বসিলেন। তথা হইতে তিনি আসিলেন এথেন্সে এবং এথেন্স হইতে স্যালোনিকায়। প্রত্যেক স্থানেই তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই একই রকম অসন্তোষ, একই রকম গুপ্ত সমিতি এবং সেই একই বিপ্লব-আয়োজন।

স্যালোনিকায় তিনি তাঁহার মাতার গৃহে লুকাইয়া রহিলেন এবং কিছুকাল বিশেষ কোন কাজে হাত দিলেন না। তাঁহার ধারণাই সত্য হইয়াছে। স্যালোনিকাই বিপ্লবের কেন্দ্র। প্রধান প্রধান জুনিয়ার অফিসারগণ সকলেই আসিয়া সেখানে সম্মিলিত হইতেছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সেখানে কোন বৃহৎ আয়োজন চলিতেছে। মা ও ভগ্নীর সাহায্যে তিনি ষ্টাফ-কলেজের তাঁহার কয়েকজন সহকর্ম্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাদের সহায়তায় বদলীর জন্য দরখাস্ত করিলেন।

কিন্তু তিনি কিছু করিবার পূর্ব্বেই সুলতানের গোয়েন্দারা তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিবার জন্য কনষ্টান্টিনোপল হইতে আদেশ আসিল। পুলিশ-বিভাগের অধ্যক্ষের সহকারী জমিল কনষ্টান্টিনোপলের 'ওতন' দলের সদস্য ছিলেন। তিনি কামালকে সাবধান করিয়া দিলেন। তিনি জানাইলেন যে, কামালের গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা দুই দিন পর্য্যন্ত কোনমতে আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে—ইহার বেশী নয়। ইতিমধ্যে যেন কামাল স্যালোনিকা হইতে সরিয়া পড়েন।
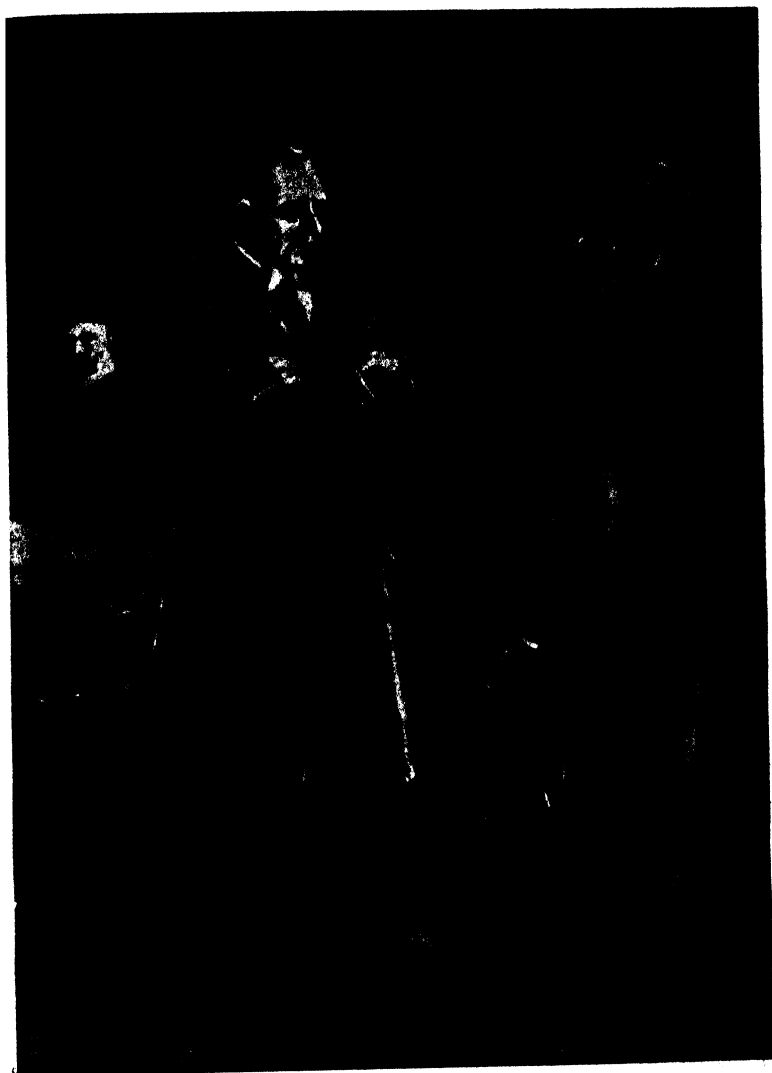
কামাল পাশা বন্দী সৈনিকদিগকে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন।

সংবাদ পাওয়া মাত্র কামাল সীমান্ত পার হইয়া গ্রীসে চলিয়া গেলেন এবং তথা হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া জাফায় আসিলেন। কিন্তু তিনি জাফায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তার গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা জাফায় যাইয়া উপস্থিত হয়। এইবার তাঁহাকে ধরিতে পারিলে আর ক্ষমা নাই। জীবনে আর তাঁহাকে লোহিত কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে না।

যে আহমদ বের সাহায্যে কামাল জাফা হইতে স্যালোনিকায় যাইবার বন্দোবস্ত করেন, সেই আহমদ বের হস্তেই কামালকে গ্রেফ্‌তার করিবার ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি কামালের সঙ্গে জাহাজে সাক্ষাৎ করিলেন এবং সেখান হইতেই গোপনে অতি তাড়াতাড়ি দক্ষিণাভিমুখে গাজায় পাঠাইয়া দিলেন। ঐ সীমান্তে তখন গোলমাল চলিতেছিল এবং দামাস্কাসস্থিত বিপ্লবী সহকর্ম্মী মুফিদ লুত্‌ফী তথাকার সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন।

আহমদ বে কন্‌ষ্টান্টিনোপলে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহাদের হয়ত ভুল হইয়াছে, কারণ কামাল সর্ব্বক্ষণই গাজাতে আছেন। তিনি কখনো সিরিয়া পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। ইতিমধ্যে মুফিদ লুত্‌ফীও জানাইলেন যে, কামাল সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গেই আছেন। এইরূপে 'ওতন' দলের দুই বন্ধুর সাহায্যে কামাল এইবারও বাঁচিয়া গেলেন।

ইহার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত কামাল চুপচাপ রহিলেন। তিনি জানিতেন, সুলতানের পুলিশ এবার তাঁহাকে ধরিতে পারিলে দিনের আলো আর তাঁহাকে দেখিতে হইবে না। তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। ঊর্দ্ধতন অফিসারেরা রিপোর্ট দিলেন যে, কামাল যথার্থই

একজন কর্ম্মদক্ষ অফিসার এবং অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ। কনস্টান্টি-নোপলের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিলেন যে, স্যালোনিকার গোয়েন্দাগণ ভুল করিয়াছিল এবং এই তরুণ অফিসারটি পূর্ব্বের বদ্‌-খেয়াল পরিত্যাগ করিয়া শান্ত জীবনযাপন করিতেছেন!

কিন্তু কামালের স্যালোনিকায় যাইবার সঙ্কল্প পূর্ব্বের মতোই অটুট। তাঁহার জন্মস্থানে যখন বৃহৎ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে তখন সুদূর সিরিয়ায় তিনি অকর্ম্মণ্যভাবে বসিয়া থাকিতে প্রস্তুত নহেন। সমর-বিভাগ হইতে নিম্নস্থ সকল বিভাগের 'ওতন'-সদস্যদিগকে তিনি জানেন। তিনি তাঁহাদের সকলের সাহায্যে স্যালোনিকায় বদলী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার আবেদন মঞ্জুর হইল। তিনি অতিসত্বর বিপ্লবের কেন্দ্র-ভূমি স্যালোনিকায় রওনা হইলেন।

এখানে আসিয়া কামাল স্টাফ-কলেজের পরিচিত বহু তরুণ অফিসারের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাদিগকে নিয়া তিনি এখানে 'ওতনে'র একটী শাখা স্থাপনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরে তিনি জানিতে পারিলেন, এই তরুণ অফিসারগণ অন্য একটী বিপ্লবীদলের সদস্য। এই বিপ্লবীদলের নাম হইল "ইউনিয়ান এণ্ড্‌ প্রগ্রেস পার্টি" অর্থাৎ "ঐক্য ও প্রগতি দল"। কামালের বাল্যপরিচিত মেসিডোনিয়ার ফেতিও এই দলের একজন সভ্য। কামালও অবশেষে এই দলের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। এই দলের নেতা ছিলেন আনোয়ার, জামাল, জাবিদ, নিয়াজী এবং তালাত। এই দলই সুলতান আবদুল হামিদকে বন্দী করিয়া

তুরস্কের রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করিয়া দেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্ত্তন করেন।

সংবাদ যখন এঙ্গোরায় এসে পৌঁছলো, বসন্তের হাওয়ায় শীতের আমেজ ছিল তখনও খুবই। শহরের বাইরে একটা ছোট পাহাড়ের উপর এক পরিত্যক্ত কৃষি-স্কুলের নির্জ্জন কক্ষে মোস্তফা কামাল বসে আছেন। নিম্নে বহুদূরপ্রসারী শস্যক্ষেত্র—বহুদিন অনাবাদ পড়ে আছে।

একটা উন্মুক্ত জানালার পাশে তিনি বসে আছেন। পাশে বিদূষী বীরাঙ্গনা খালেদা, তাঁর স্বামী আদনান আর আলি ফৌদ উপবিষ্ট। জানালার একপাশে হেলান দিয়ে উদাসদৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন ইস্‌মত।

সংবাদ এসেছে: কোনিয়ায় প্রেরিত কামালের অফিসারদের সোলতানের লোক হাত-পায়ের নখ ও গায়ের চামড়া খুলে ফেলে ঘোড়ার লেজে বেঁধে পথে পথে হেচ্‌ড়িয়ে মারছে। তাদের দলের লোক এতে উন্মত্ত হয়ে যেখানে-সেখানে সোলতানের লোকদের গুলী করে মারছে! কিন্তু সোলতানের লোক তাদের ধ্বস্তবিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

সোলতানের আদেশানুযায়ী দামাদ ফরিদের অধীনস্থ সমস্ত ন্যাশন্যালিষ্ট অফিসারদের বন্দী করা হয়েছে। ধর্ম্মের নামে, খলিফার নামে সমস্ত জনসাধারণকে তাদের বিরুদ্ধে উস্‌কিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফর্ম্মান জারী হয়েছে: ধর্ম্মদ্রোহী—রাজদ্রোহী কামাল আর তাঁর

দলের নেতাদের যারা প্রকাশ্যে বা গোপনে হত্যা করবে, তারা গাজী তো হবেই—তা'ছাড়া সোলতান তাদের পুরস্কৃত করবেন। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তারা পুরস্কৃত হবে।......

সূর্য্য ডুবে গেছে। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া দিগন্তবিস্তারিত আনাতোলিয়ার সমভূমির উপর ধীরে ধীরে তার কালো পর্দ্দা টেনে দিচ্ছে।

চুপে চুপে তাঁরা কথা বলছেন। কখনো বা আকস্মিক বিপদাশঙ্কায় মাথা তুলে উৎকর্ণ হয়ে পিছনের দিকে তাকান—কি জানি গুপ্তশত্রুর শাণিত অসি কখন অলক্ষিতে তাঁদের মাথার উপর ঝলসে উঠে!... প্রতিটী ছায়ায় যেন তাঁরা বিপদের ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন।—আজ তাঁরা নির্ব্বাসিত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত! যারা তাঁদের হত্যা করবে, তারা হবে অশেষ পুণ্যের অধিকারী...এই ভাবনাই এখন তাঁদের বিচলিত করে তুলেছে·

চারদিক থেকে প্রতিমুহূর্ত্তে আসছে শুধু দুঃসংবাদ। স্মার্ণা থেকে গ্রীকরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করে, সারা-দেশটাকে জনমানবহীন ভীষণ শ্মশানে পরিণত করে অগ্রসর হচ্ছে। ...দক্ষিণ প্রদেশ ফরাসীদের হস্তগত।—সোলতানের চরেরা কুর্দ্দীদের লেলিয়ে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।...চারদিকে একটা আসন্ন গৃহযুদ্ধের করাল ছায়া মুখব্যাদান করে সারাটা দেশকে গ্রাস করতে উদ্যত।... এই গৃহযুদ্ধের লেলিহান শিখা কখন যে কোন্‌খানে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আজ এখানে—কাল সেখানে

বোলোতে ইতিমধ্যেই তা আত্মপ্রকাশ করেছে। শীঘ্রই হয়তো তারা এঙ্গোরায় এসে উপস্থিত হবে। তারা টেলিগ্রামের তার ছিঁড়ে ফেলছে। দু'জন কর্ম্মচারীকে তাদের বুঝিয়ে নিরস্ত করবার জন্য পাঠানো হয়েছিলো। উন্মত্ত জনতা তাদের বন্দী করে কনস্টান্টি-নোপলে সোলতানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের ফাঁসীও হয়ে গেছে।

সোলতানের সেনাবাহিনীর গতিরোধ করতে হেন্‌দেকে যে সৈন্যদল পাঠানো হয়েছিলো, তা পর্য্যুদস্ত হয়ে গেছে। সোলতানের সৈন্য-বাহিনীর কাছে তারা তিষ্ঠাতে পারছে না। তারা ইস্‌মিদ অধিকার করে নিয়েছে। বিঘার অধিকার করে ব্রুসা শহরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। কোনিয়া, আদাবাজার প্রভৃতি দশ বারোটা শহর বিনা বাধায় সোলতানের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের নিজের সৈন্যদলেও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। সামসূনের ১৫শ বাহিনী বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কাজিম কারা বাকেরের কর্ত্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে। পূর্ব্বপ্রদেশের সৈন্যরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়। স্মার্ণার পার্ব্বত্য অঞ্চলে অনিয়মিত বাহিনী তাদের হস্তচ্যুত হয়েছে। তাদেরই অন্যতম নেতা আদম স্বাধীনভাবে কাজ করছে। তাদের বশ্যতা বা নির্দ্দেশ মানতে সে নারাজ। পরাজয়ের কালো ছায়া চারদিকে ঘনিয়ে আসছে।···নারীরা পর্য্যন্ত আজ বিরোধী। তারা এক সভায় সমবেত হয়ে অভিমত প্রকাশ করেছে যে: "দার্দ্দানেলিসে আমরা আমাদের বহু পুরুষ হারিয়েছি।···ইংরেজ কনষ্টান্টিনোপোল অধিকার করেছে, সেজন্য এঙ্গোরায় আবার আমাদের লোকক্ষয়

করবার প্রয়োজন কি? কনস্টান্টিনোপোল রক্ষা করতে হয়, সেখানকার লোক তা করবে। আর এতে ফলও হবে না কিছুই।...আমরা চাই শান্তি।..."

একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে কামাল চুপ করে বসে আছেন। চোখ বুজে ভাবছেন। মুখে তাঁর গভীর চিন্তার ছায়া। আজ তিনি সৈনিকহীন সেনাপতি, বিত্তহীন প্রাদেশিক রাষ্ট্রনায়ক। না আছে সৈন্য, না আছে অস্ত্র। বিদেশীদের হাত থেকে স্বদেশকে উদ্ধার করবার, জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করবার সুন্দর উপায় তিনি করে রেখেছিলেন। কিন্তু আত্মকলহে দেশ আজ ক্ষত-বিক্ষত—দেশ আজও বিদেশীদের মুষ্টিগত। তাঁর সব চেস্টা, তাঁর সব পরিশ্রম আজ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হতে চলেছে।—আজ তিনি দেশদ্রোহী, নির্ব্বাসিত। তাঁর মস্তকের মূল্য আজ লক্ষ টাকা।......

অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌ছে। মুক্ত বাতায়নপথে পাহাড়ের ফাঁকে নূতন চাঁদ দেখা দিয়েছে! কারাবাসের নীচের জঙ্গল থেকে ধূসর নেকড়ের ভীষণ চীৎকারধ্বনি ভেসে আস্‌ছে।

সে চীৎকারধ্বনি শুনে মোস্তফা কামাল সোজা হয়ে বসলেন। পরমুহূর্ত্তে বন্য হিংস্রপ্রাণীর মতো লাফিয়ে উঠে আপন মনে রুক্ষস্বরে বলে উঠলেন: "এঙ্গোরায় ধূসর নেকড়ের চীৎকার!"

পায়চারী করতে করতে আপন মনে বলতে লাগলেন: "যুদ্ধ আমি করবই।"

একমুহূর্ত্তে সমস্ত জড়তা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত আশঙ্কা ও নিরুৎসাহ গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিলেন। আবার তিনি জীবনীশক্তি ফিরে

পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গীরাও যেন মৃতদেহে প্রাণ ফিরে পেলেন। নূতন আশায় তাদের হৃদয়-মন উদ্বেলিত হয়ে উঠলো।

বজ্রকঠোর স্বরে তিনি কক্ষে আলো জ্বালবার নির্দ্দেশ দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত বাড়ীখানা যেন তড়িৎস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো।...

"যুদ্ধ আমি করবই। তুরস্ককে আমি বাঁচাবই। তাকে বিদেশীর হাত থেকে উদ্ধার করে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করবই......"

মোস্তফা কামাল এবার কক্ষের একটা প্রাচীর-গাত্রে হেলান দিয়ে ভাবতে লাগলেন : বিপদ-সঙ্কুল তাঁর জীবন! ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই তাঁকে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ করতে হবে।...

এঙ্গোরার আশেপাশের গ্রামগুলি একে একে সোলতানের সৈন্য-দলে যোগ দিচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্ত্তে এঙ্গোরায়ও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে পারে। তারপরই হয়তো তারা তাঁদের আক্রমণ করে হত্যা করতে পারে।

একজন প্রহরী এসে বললে : "অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সন্দেহ-জনক ভাবে কে যেন ঘুরছে।..."

তাই যদি হয়, তবে কামাল আর আরিফ—তাঁদের ঘোড়া প্রস্তুত—মুহূর্ত্তমাত্রে তাই চড়ে চক্ষের নিমেষে তাঁরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারবেন। তারপরই সিভাসে গিয়ে তাঁরা আশ্রয় নেবেন। খালেদা রিভলবার চালাতে শিখেছেন। আদনান বিষ সংগ্রহ করে রেখেছেন। —খলিফার লোকদের হাতে নির্য্যাতন ভোগ করে মরার চেয়ে বিষ খেয়ে মরাই যুক্তিসঙ্গত।......

সারাদিন সারারাত শুধু একটানা কর্ম্মস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছেন। ক্লান্তি বা অবসাদের ভাব ক্ষণেকের তরেও তাঁদের নিরস্ত করতে পারেনি। সম্মুখে বহুবিধ সমস্যা উপস্থিত। সমস্তের সমাধান করতে হচ্ছে। সংবাদ আদান-প্রদান সাবধানে করতে হয়। প্রতিদিন সংবাদ আসছে যে সোলতানের বাহিনী শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম জয় করে এগিয়ে আস্‌ছে। চারদিক থেকে শুধু পরাজয়ের সংবাদ আস্‌ছে! মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি বিচলিত হচ্ছেন না। কফির পর কফি, সিগারেটের পর সিগারেট চলেছে অবিরাম গতিতে।

মোস্তফা কামালের পিছনে ইস্‌মত সারারাত ধরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। কখনও জানালা দিয়ে বাইরে চাইছেন, কখনও বা কামালের সামনে গিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে পরামর্শ করছেন। অন্য কক্ষে ফেভ্‌জি কর্ম্মরত।

যুদ্ধ চলেছে ভীষণ বেগে। কক্ষে বসে কামাল বজ্রকঠোর নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। নির্ম্মম নিষ্ঠুর তাঁর হৃদয়। সোলতানের যে-সমস্ত হতভাগ্য সৈনিক যুদ্ধে বন্দী হয়েছে, নিষ্ঠুরভাবে তাদের হত্যা করবার আদেশ দিচ্ছেন।......

একজন আমেরিকান সেনাপতি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, ন্যাশন্যালিষ্ট দল যদি পরাজিত হয়, তবে তিনি কি করবেন? উত্তর দিলেন: "যে-জাতি তার দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারে, সে-জাতি কখনও পরাজিত হতে পারে না। পরাজয় মানে, জাতির মৃত্যু।"

তিনি জানেন যে তাঁর জাতি আজও মরে যায় নি, বেঁচে আছে।

স্বজাতির প্রতি এই দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। তাঁর প্রতি কথায়, প্রতি বক্তৃতায় এবং প্রতি নির্দ্দেশে এ-কথাই দৃঢ়ভাবে ফুটে উঠত।

"জয়ী হও, অথবা এ-ভীষণ যুদ্ধে নিজেরা মিস্‌মার হয়ে যাও।" সৈনিকদের প্রতি এই ছিল তাঁর একমাত্র নির্দ্দেশ। তাঁর এই নির্দ্দেশ সৈনিকদের প্রাণে তড়িৎ স্পন্দনের মত কাজ করতে লাগলো।

গ্রীকদের অগ্রগতি প্রতিহত হল। সোলতানের সৈন্যবাহিনী পর্য্যুদস্ত হলো। ফরাসী সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হলো। আর্ম্মেনিয়ানদের আশা চিরতরে নির্ম্মূল হলো। বিদ্রোহী কুর্দ্দিরা বিধ্বস্ত হলো। কোনিয়া থেকে ইটালীয়রা বহিষ্কৃত হলো। দেখতে দেখতে এস্কি শহরের ইংরেজবাহিনী আক্রান্ত হলো। তুর্কী ন্যাশন্যাল সৈন্যদলের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পলায়ন করতে বাধ্য হলো। তুর্কীবাহিনী সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত তাদের তাড়া করলো। মিত্রশক্তিদের বড় বড় কর্ত্তারা তাদের হাতে বন্দী হলো।

এ-সমস্ত অদ্ভুত কর্ম্ম দেশবাসীদের চোখ খুলে দিল। সোলতানের প্রতি ভক্তিভাব ও মিত্রশক্তির ভয় তাদের প্রাণ থেকে দূর হলো। তাদের প্রাণে জাতীয় গৌরব জেগে উঠলো! দলে দলে তারা ন্যাশন্যালিষ্টদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগলো। পরাজয়ের আশঙ্কা তাদের প্রাণ থেকে দূর হলো। সকলেই বুঝতে পারলো যে, যতদিন কনস্টান্টিনোপল বৃটিশের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকবে, ততদিন আর কিছুই করা সম্ভবপর নয়। সোলতান বা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টে আস্থাস্থাপন করায় কোন ফল নেই। মোস্তফা কামালের কথাই ঠিক। নিজেরাই

নিজেদের রক্ষা করতে হবে। সশস্ত্র প্রতিরোধ দ্বারাই বিদেশীর হাত থেকে তুর্কীকে মুক্ত করতে হবে।

দলে দলে পুরুষ ও রমণী এসে স্বেচ্ছাসেবক হতে লাগলো। কৃষক-রমণীরা অস্ত্রশস্ত্র বয়ে নিয়ে চললো যুদ্ধক্ষেত্রে। সম্ভ্রান্ত রমণীরা আহতদের সেবায় লেগে গেলেন। সকলের দৃষ্টিই এখন কামালের উপর। সোলতানের সৈন্যদলে ভাঙন ধরলো। তারা যুদ্ধ করতে অসম্মত হলো এবং কোন কোন দলপতিকে হত্যা করতেও কসুর করলে না।

যে-সমস্ত ন্যাশন্যালিস্ট নেতা বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করেছিলেন, সুযোগ বুঝে এঙ্গোরায় এসে তাঁরা সমবেত হতে লাগলেন।

মোস্তফা কামালের নির্দ্দেশ মত এঙ্গোরায় পার্লামেণ্টের পুনরুদ্বোধন করবার ধূম পড়ে গেল। সোলতানের আদেশে পূর্ব্বে তাহা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই পার্লামেণ্টের নামকরণ হলো "গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল এসেম্বলী"। এবং একেই তুরস্কের নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট বলে ঘোষণা করা হলো। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তার সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন কামাল।......

কাল যে কামাল ছিলেন নিঃসঙ্গ একক, সেই কামালই আজ তুরস্কের একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা।...

এসেম্বলীর প্রেসিডেণ্ট হিসাবে কামাল ফরাসী রাষ্ট্রপতির উদ্ধত-বার্ত্তার উত্তর দিলেন :

"এঙ্গোরার এই গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল এসেম্বলীই তুরস্কের একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা। যতদিন রাজধানী পুনরধিকার করতে না পারি,

ততদিন একটি মাত্র বিদেশীকে এদেশে থাকতে দেব না। এই বিদেশীদের স্বীকার করতে হবে যে তুরস্কও তাদের সমকক্ষ—কোন অংশে হীন নয়। তুর্কী কোন দিনই কোন বিদেশী শক্তির কাছে মাথা নত করবে না। যতদিন একটিও তুর্কী জীবিত থাকবে, ততদিন এ-দীনতা সে স্বীকার করবে না।"

* * *

সুদূর প্যারীতে সভাপতি উইলসন, লয়েডজর্জ, ক্লেমেনস্থ শান্তি-বৈঠকে বসে পৃথিবীর ভবিষ্যৎনির্ণয় করছিলেন। তুর্কীর ভাগ্যে তাঁদের প্রভুত্বমূলক নির্দেশ হলো: "তুরস্ক মহাযুদ্ধে হেরে গেছে,—তার আর কোন সত্তাই থাকবে না। মিত্রশক্তি……"

এমন সময় কামালের এই অদ্ভুত বিজয়বার্ত্তা তাঁদের মাথায় যেন বাজের মতো এসে পড়লো। মনে মনে বললে: "তাইতো! একটা বিদ্রোহী সেনানায়কের কাছে সমস্ত মিত্রশক্তি পর্য্যুদস্ত!"……তাঁদের মুখে একটা নিঃসহায় ভাব!—"তাইতো, কি করা যায়?"

—"না, যে করেই হোক, তুরস্ককে মিত্রশক্তির চাই-ই।"…

য়ুরোপের ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে সেদিন যে বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতেই শক্তিমদগর্ব্বিত য়ুরোপ তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

আজকে তোমাদের মলেয়ারের জীবনের গল্প ব'লব। মলেয়ার কে জান ?

ফ্রান্সের সব চেয়ে বড় নাট্যকার—ফ্রান্সের মহাপুরুষদের মধ্যে একজন মহাপুরুষ। ফ্রান্সের কেন, শেক্‌স্‌পীয়ারের মত মলেয়ার হ'লেন সকল দেশের সকল জাতির একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

তোমরা জান এই মানুষের জীবনে নিত্য কত অঘটন ঘ'টছে। অতি দরিদ্র লোক অধ্যবসায়ের বলে জগতের শ্রেষ্ঠ ধনী হ'চ্ছেন, পথের ভিখারী অন্তরের শক্তিতে রাজার সিংহাসনে ব'সছেন, রাজা প্রজার কল্যাণের জন্য তাপস-ব্রত গ্রহণ ক'রছেন, মা ছেলের জন্য মৃত্যুকে বরণ ক'রছেন, বন্ধু বন্ধুর জন্য আত্মোৎসর্গ ক'রছেন—ত্যাগে, দানে, শক্তিতে, শৌর্য্যে, মানুষ এই পৃথিবীকে স্বর্গ ক'রে তুলছে।

কিন্তু এই যে মানুষের জীবন, এর আর একটা দিক আছে। সেখানে মানুষ অজ্ঞানতার জন্য নিত্য ভুল করে, বোকামির জন্য

নিজেকে এবং সেই সঙ্গে অপর সকলকে বিব্রত ক'রে তোলে, একটু-খানি স্বার্থের মোহ বজায় রাখবার জন্য মানুষ সেখানে জঘন্য পাপ আর অন্যায় করে, নিজেদের দোষত্রুটি লুকিয়ে রেখে লোকের সামনে সাধু সাজবার প্রাণপণ চেষ্টা করে; সেখানে সে একটুতেই ভুল করে, একটুতেই রেগে উঠে, একটুতেই আঘাত ক'রতে যায় এবং তার ফলে একটুতেই আহত হ'য়ে পড়ে—সেই যে মানুষের মনের অন্ধকার দিক, যা দেখে দেবতারা হাসেন আর হয়ত চোখের জল ফেলেন, মলেয়ার তাঁর নাটকে মানুষের মনের সেই অন্ধকার দিকটা ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের সেই সব ভুল ভ্রান্তি দেখে তিনি দেবতার মত হেসেছেন এবং হাসতে গিয়ে মানুষের দুর্গতি দেখে গোপনে চোখের জল মুছেছেন। মলেয়ারের নাটকগুলি যখন তোমরা বড় হ'য়ে প'ড়বে, তখন দেখবে, মানুষের যে-সব ত্রুটির কথা তিনি লিখে গিয়েছিলেন, আজও সমান ভাবে সেই সব ত্রুটি আমাদের আজকের মানুষের মধ্যে একই ভাবে রয়েছে। সেদিন যদি পার, মলেয়ারের নাটক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তোমাদের আশেপাশের জীবনের দিকে চেয়ে দেখ, চিনে নিও কোথায় মানুষ ভুল ক'রে চ'লেছে, আর যদি পার, মানুষের সেই সব দোষত্রুটি দেখে মলেয়ারের মত হেসে উঠ এবং সেই সঙ্গে ভুল না, যারা ভুল করে, জগতে তাদেরই সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন তোমাদের সমবেদনার।

মলেয়ারের নাটক যেমন আমাদের জীবনকে নতুন ক'রে দেখতে শেখায়, মলেয়ারের নিজের জীবনও কিন্তু তাঁর নাটকের চেয়ে কম বিচিত্র নয়।

আজ থেকে প্রায় তিনশ' বার বছর আগে, অর্থাৎ ১৬২২ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী শহরে মলেয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন অবশ্য তাঁর নাম মলেয়ার ছিল না। যে নামে আজ তিনি জগতে পরিচিত, সে-নাম তিনি পরে নিজেই গ্রহণ করেন এবং জন্মাবার সময় তাঁর বাপ-মা যে-নাম রেখেছিলেন তাঁর নিজের নেওয়া নামের আড়ালে সে-নাম একেবারে হারিয়ে যায়। তাঁর বাপ মা নাম রেখেছিলেন জাঁ ব্যাপ্‌তিস্তে পোক্যেলোঁ।

তাঁর বাবা আসবাব পত্র তৈরী ক'রতেন এবং পরে রাজপ্রাসাদের আসবাব পত্র তদারক ক'রবার চাকরী পান। শেক্‌স্‌পীয়ারের জীবনে তোমরা দেখেছ, তাঁর বংশের মধ্যে কারুর যে থিয়েটার বা নাটক দেখবার কোনও প্রীতি ছিল এমন কোন কথা জানা যায় না। শেক্‌স্‌পীয়ার নিজে ঘোড়া ধরবার চাকরী নিয়ে থিয়েটারের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু মলেয়ারের জীবনে অতি বালক-কাল থেকে থিয়েটারের সঙ্গে অন্যভাবে পরিচয় হয়।

তাঁর ঠাকুরদাদার থিয়েটার দেখার বড় সখ ছিল। তিনি প্রায়ই জাঁ-কে তাঁর সঙ্গে থিয়েটারে নিয়ে যেতেন। সেই শিশুকালেই থিয়েটারে গিয়ে গিয়ে থিয়েটারের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ তাঁর মনে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তাঁর বাবা ছেলের মনের ভাব বুঝতে পেরে তাঁকে স্কুলে পাঠালেন। স্কুলের পড়া শেষ হ'লে, তিনি আইন প'ড়তে আরম্ভ ক'রলেন। কিন্তু আইন পড়ায় তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল না—তাঁর বাবা চেয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর

ছেলে যাতে রাজপ্রাসাদের চাকরীটি পায়, এখন থেকেই তার ব্যবস্থা করা।

কিন্তু ছেলেটির মনে ছিল অন্য বাসনা।

সে-সময় ফরাসী দেশের সিংহাসনে ছিলেন চতুর্দ্দশ লুই। নানা দিকের ঐশ্বর্য্যে তখন তাঁর রাজত্ব ভ'রে উঠছিল। ফ্রান্সের ইতিহাসে এক নতুন জাগরণের সময় এসেছে তখন। বড় বড় নাট্যকার, বড় বড় কবি, বৈজ্ঞানিক তখন ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। রাজ-দরবারে তাঁদের অসীম সম্মান।

সেই সব সাহিত্যিক এবং কবিদের প্রতিষ্ঠা এবং সম্মান দেখে মলেয়ারের মনে তীব্র বাসনা হ'ল যে, তিনিও লিখে তাঁদের মত খ্যাতি অর্জ্জন ক'রবেন। কাঠের আসবাব তৈরী ক'রে শুধু কোন রকম ক'রে দুমুঠো অন্নের জোগাড় হ'লেই কি জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হ'য়ে গেল?

আত্মীয়স্বজন কারুর কথা না শুনে তিনি গোপনে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একটা থিয়েটারের দল তৈরী ক'রলেন। নিজে সেই দলের নাট্যকার, অভিনেতা, অধ্যক্ষ হ'লেন। এই সময়েই তিনি বাপ-মায়ের দেওয়া নাম ত্যাগ ক'রে মলেয়ার নাম গ্রহণ ক'রলেন। এবং এই নামেই জগতের অমর মানুষদের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়।

কিন্তু যশ এত শীগ্‌গির আসে না। যে-কীর্ত্তি মৃত্যুর পরও মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, জীবন দিয়েই তাকে কিনতে হয়। অল্প কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে, ব্যবসা-হিসাবে তেমন কিছুই সুবিধা হ'চ্ছে না।

মলেয়ার ধার ক'রতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন সুবিধা হ'ল না। অবশেষে ধার এত বেশী হ'ল যে, পাওনাদারদের তাড়নায় তাঁকে আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে উঠতে হ'ল। শোধ দিতে অপারগ হওয়ায় বিচারে কারাদণ্ড হ'ল। জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে নাট্যকারের অন্তরের প্রতিভা ফুটে উঠতে লাগল।

কয়েকমাস কারাবাস ক'রে আসার পর, মলেয়ার দেখলেন তাঁর দলের লোকেরা সকলেই ঠিক আছে, তারা তাঁর সঙ্গে মিলে কষ্ট-স্বীকার করতে প্রস্তুত। মলেয়ার মনে জোর পেলেন। এবার ঠিক ক'রলেন, রাজধানীতে আর নয়—এবার সারা ফ্রান্স ঘুরে বেড়াবেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে অভিনয় ক'রবেন। সকলেই সম্মত। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দের একদিন মলেয়ার তাঁর দলবল নিয়ে প্যারী শহর ত্যাগ ক'রলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ।

বার বছর ধ'রে তিনি তাঁর সেই দল নিয়ে সারা ফ্রান্স ঘুরে বেড়ালেন। সরাইখানার সামনে, বাজারে, হাটে, রাস্তার ধারে অভিনয় ক'রে তাঁদের দিন কাটত। কিন্তু এই বার বছর ঘুরে বেড়ানোর সমস্ত ইতিহাস যখন তোমরা বড় হ'য়ে প'ড়বে, তখন তার মধ্যে দেখবে, একটা মানুষ কেমন ক'রে বার বছর ধ'রে নানা রকম দুঃখ দৈন্যের মধ্যে থেকে, মানুষকে জানতে শিখেছে, মানুষকে দেখতে শিখেছে, মানুষকে বুঝতে শিখেছে। এই বার বছর ধ'রে নানা চরিত্রের মানুষ সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রেছিলেন, তাঁর নাটকে আমরা প্রতি কথায় তার পরিচয় পাই এবং তাঁর এই অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনও ফাঁকি ছিল না ব'লেই, তিনি যেসব লোকের

কাল্পনিক রোগগ্রস্ত নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে
মলিয়ের দেহত্যাগ করলেন

চরিত্র এঁকেছেন, মনে হয় যেন তারা জীবন্ত। তাদের মনের অলি-গলির, তাদের প্রত্যেক কথার ভঙ্গীর, তাদের চরিত্রের প্রত্যেক সামান্যতম বৈচিত্র্যটুকু তিনি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তিনশ' বছরের পরিবর্ত্তন পার হ'য়ে মনে হয় সেই সব জীবন্ত লোকদের আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি। মানুষকে এতখানি নিবিড় ক'রে যাঁরা দেখতে পান, ভগবানের সৃজনীশক্তির অংশ তাঁরা পান, তখন তাঁদের মনে এমন একটা শক্তি জন্মগ্রহণ করে, যার সাহায্যে তাঁরা এমন সব চরিত্র তৈরী করেন অথবা যে-সব চরিত্র আঁকেন তাদের এমন ক'রে গ'ড়ে তোলেন যে, তারা সকল কালের, সকল জাতির সম্পত্তি হ'য়ে যায়। এই বার বছর ঘুরে বেড়ানর অভিজ্ঞতার ফলে মলেয়ার যখন আবার রাজধানীতে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মুখে-চোখে, প্রশস্ত ললাটে, কথার ভঙ্গীতে সেই দিব্য পরিপূর্ণতার লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে। রাজা, রাজসভাসদ্‌গণ, ফ্রান্সের সমস্ত নাট্যকার, কবি এই নূতন লোকটির দিকে আগ্রহে ফিরে চাইল। বার বছর আগে কারাগারে কে ছিল, সে কথা সবাই গেল ভুলে!

মলেয়ারের অভিনয়ের জন্য চতুর্দ্দশ লুই একটা বিরাট হল নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন। সেই হলে ফ্রান্সের রাজা, রাজসভাসদ্, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে মলেয়ার আবার অভিনয় আরম্ভ ক'রলেন। এই হলই পরে ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটার কমেদী ফাঁসয়ে অথবা থিয়েতার মলেয়ারে পরিণত হয়।

এই সময় তাঁর পিতা পরলোকগমন ক'রলেন এবং মৃত্যুকালে তিনি তাঁর কৃতী পুত্রকে ডেকে নিবেদন জানিয়ে গেলেন যে, তাঁর

মৃত্যুর পর রাজদরবারের কাজটি যেন তিনি গ্রহণ করেন। পুত্র পিতার এই শেষ মিনতি রক্ষা করলেন।

বার বছর সারা ফ্রান্স ঘুরে মলেয়ার সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিশে তাদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক ভাল ক'রে দেখবার সুবিধা পেয়েছিলেন। রাজদরবারে এই চাকরি নেওয়ার তাঁর আর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। যে-সব শ্রেণীর লোক অর্থের এবং বংশমর্য্যাদার গৌরবে নিজেদের জনসাধারণ থেকে দূরে রাখতে চায়, এবং যারা মনে করে যে তাদের নিয়েই জাতি এবং সমাজ, সেই সব শ্রেণীর লোকদের ভাল ক'রে দেখবার সুবিধা, এই কাজ নেওয়ার ফলে অনায়াসেই ঘ'টবে। মজার ব্যাপার, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের উপর ভার প'ড়ল, রাজা চতুর্দ্দশ লুইএর শয্যা প্রস্তুত করার! একজন রাজ-ভৃত্যের সাহায্যে মলেয়ার এই কাজ সম্পন্ন করাতেন।

যে রাজ-ভৃত্যটি মলেয়ারকে এই বিষয়ে সাহায্য ক'রত, সে কিন্তু নিজেকে সামাজিক হিসাবে মলেয়ারের ঢের বড় মনে ক'রত। একজন কমিক অভিনেতা—সে আবার ভদ্রলোক! একদিন ব্যাপার এরকম দাঁড়াল যে, সে মলেয়ারের সঙ্গে কাজ করাকে অপমানজনক মনে করে ব'লে প্রকাশ্যে ঘোষণা ক'রল। সে রাজার ভৃত্য, সে ভদ্রশ্রেণীর লোক! আর মলেয়ার একজন কমিক অভিনেতা, নাটুকে লোক, অস্পৃশ্য! য়ুরোপেও একদিন মলেয়ারের মত নাট্যকার আর অভিনেতা সম্বন্ধে অভিজাত শ্রেণীর এই ধারণা ছিল। কিন্তু চতুর্দ্দশ লুই, সেই সময়কার ফরাসী অভিজাতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিজাত, তিনি মলেয়ারকে ভালবাসতেন।

ভার্সাই-এর বিখ্যাত রাজসভায় চারিদিকে যে-সব লোক সমবেত হ'ত, তাদের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতাকে নিয়ে মলেয়ার ব্যঙ্গ ক'রে নাটক লিখতে লাগলেন। জীবনের মধ্যে যেখানে তিনি দেখতেন ফাঁকি, যেখানেই দেখতেন ত্রুটি, সেখানেই তিনি হেসে উঠতেন। সে হাসি তারা বুঝতে পারত না—তারা নিজেদের অপমানিত মনে ক'রত—তারা মনে ক'রত শুধু তাদেরই বুঝি ব্যঙ্গ ক'রবার জন্য রাজার-বিছানা-করা চাকরটা এই সব লিখছে। কিন্তু মলেয়ারের কাছে তারা ছিল মাত্র উপলক্ষ্য—তিনি হাসতেন তাদের দেখে, যারা জীবনকে বোঝে নি—মানুষকে বোঝে নি—তারা সেকালেও ছিল—তারা একালেও আছে—যতদিন পৃথিবীর ঘোরা শেষ না হবে—ততদিন পর্য্যন্ত হয়ত থাকবে। এই হ'ল কবির কাজ, এই হ'ল স্রষ্টার কাজ। কিন্তু ভার্সাই-এর রাজসভায় যারা ভিড় করেছিল তারা সেদিন এই কবিকে দেখতে পায় নি—তারা দেখেছিল, রাজার বিছানা-করা চাকরের স্পর্দ্ধা!

রাজার প্রাসাদের ভিতরে রাজ-ভৃত্যরা এই অদ্ভুত নাটুকে লোকটিকে সহ্য ক'রতে পারত না। একদিন যখন তারা সকলে একসঙ্গে খেতে বসেছে, তারা সকলে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, মলেয়ারের সঙ্গে একাসনে তারা খাবে না। সেইদিন থেকে মলেয়ার একলা খেতে আরম্ভ ক'রলেন। চতুর্দ্দশ লুই-এর কানে এই কথা গিয়ে পৌঁছল। একদিন সকাল বেলায় যখন তিনি প্রাতরাশ করতে ব'সেছেন—সেই সময় তিনি রাজ-ভৃত্যদের সামনে মলেয়ারকে ডেকে পাঠালেন। তাদের সামনে তাঁর আসনের পাশে মলেয়ারকে বসিয়ে

তিনি হেসে ব'লে উঠলেন—আমি যার সঙ্গে এক টেবিলে খাই, তার সঙ্গে একাসনে আহারে ব'সতে আমার ভৃত্যরা না চাইতেও পারে! এই ঘটনার পর থেকে অভিজাত-শ্রেণীর বড় বড় লোকরা তাঁকে টেবিলে তাঁদের সঙ্গে আহার-গ্রহণ করবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাতে লাগল।

মলেয়ার তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি সমস্তই পেয়েছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় জীবনে তিনি কখনো শান্তি পান নি। যখন তাঁর চল্লিশ বছর বয়স তখন তিনি তাঁর দলের একটি মেয়েকে বিবাহ করেন, কিন্তু এ বিবাহে তিনি একদিনের জন্যও সুখী হ'তে পারেন নি। তাঁর জীবনের শেষ দশ বছর তিনি জগতের কুড়িখানি শ্রেষ্ঠ নাটক লেখেন, তার অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন এবং নিজে প্রত্যেক বইতে অভিনয় করেন কিন্তু এই দশ বছর ভয়াবহ রুগ্ন এবং অসুস্থ অবস্থায় তাঁর দিন অতিবাহিত হয়। এই দশ বছরের মধ্যে প্রায়ই এমন দিন গিয়েছে, যখন মনে হয়েছে, যে, তাঁর শেষদিন উপস্থিত। কিন্তু এই ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি তাঁর আশৈশবের স্বপ্নের রূপ দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

এই দশ বছর ক্রমান্বয়ে চিকিৎসা ক'রেও কোন ফল-লাভ হয়নি। বহু ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর এই সময় পরিচয় হয় এবং এই পরিচয়ের ফলে তাঁর নাটকে ডাক্তাররা রেহাই পান নি। তাঁদের নিয়ে বিদ্রূপ করবার লোভ তিনি সম্বরণ ক'রতে পারতেন না। একবার অসুস্থ

অবস্থায় চতুর্দ্দশ লুই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে আসেন। জিজ্ঞাসা করেন, তোমার একজন ভাল ডাক্তার আছে শুনেছি, কিন্তু তুমি ত বিছানা ছাড় না দেখছি! ডাক্তার ওষুধ দেয় না?

মলেয়ার হেসে ব'লেছিলেন, ডাক্তার ওষুধ দেয়, যখন খাইনা তখন ভাল থাকি।

ডাক্তারদের নিয়ে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে ব্যঙ্গ করার ফলে রাজধানীর ডাক্তাররা ক্ষিপ্ত হ'য়ে চতুর্দ্দশ লুইএর কাছে দরবারে আসেন। তাদের কথা শুনে লুই হেসে বলেছিলেন, দোষ কি! ডাক্তাররা প্রায়ই আমাদের কাঁদান—যদি মাঝে মাঝে তারা একটু হাসাতেও পারেন, তাতে দোষ কি?

ব্যক্তিগত জীবনে মলেয়ার যেমন উদার, তেমনি দাতা এবং একান্ত সদালাপী ছিলেন। একবার বেড়াতে বেড়াতে পথে এক দরিদ্র লোক ভিক্ষা চাইলে তিনি একটা স্বর্ণমুদ্রা তার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে আসছিলেন। দরিদ্র লোকটি স্বর্ণমুদ্রা দেখে দাতার ভুল হ'য়েছে মনে ক'রে তাড়াতাড়ি মলেয়ারের কাছে গিয়ে জানাল, মশায়ের ভুল হ'য়েছে, এটা স্বর্ণমুদ্রা।

পকেট থেকে আর একটা স্বর্ণমুদ্রা বার ক'রে মলেয়ার ব'ল্লেন, ভুল হয়নি। আমি ইচ্ছে ক'রেই দিয়েছি। আর তোমার সাধুতার জন্য তুমি আর একটা স্বর্ণমুদ্রা নাও।

কিন্তু শেষ দিকে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। তিনি আর নিয়মিত থিয়েটারে অভিনয় ক'রতে পারতেন না। তার ফলে তাঁর দলের লোকের অসুবিধা হ'তে লাগল। সেই সময় রোগ-শয্যায়

শুয়ে তিনি একখানি নাটক লেখেন। নাটকখানির যিনি নায়ক—তাঁর ধারণা যে তাঁর কঠিন পীড়া হয়েছে; অথচ আসলে তিনি বেশ সুস্থই আছেন। এই কাল্পনিক রোগগ্রস্ত লোকটি নিজেকে অসুস্থ মনে করতে করতে শেষে সত্যই ম'রে যান। এই হ'ল নাটকের প্রধান বিষয়। মলেয়ার স্থির ক'রলেন যে, এই নায়কের ভূমিকা তিনি গ্রহণ ক'রবেন।

কিন্তু তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে, তাঁর বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁকে বারণ ক'রল। কিন্তু তিনি কারুর কথা শুনলেন না। ব'ল্লেন, আমার উপর পঞ্চাশটি লোকের অন্ন নির্ভর ক'রছে—আমার শুয়ে থাকলে চলবে কেন?

অভিনয়ের দিন তিনি রঙ্গালয়ে এলেন। অভিনয়ে নামলেন। শেষ-দৃশ্যে সেই কাল্পনিক রোগগ্রস্ত লোকটি যখন মারা যাচ্ছে—তখন মলেয়ারের অভিনয় দেখে জনতা আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে করতালি দিতে আরম্ভ করল। কিন্তু ঠিক সেই সময়, শুধু নাটকের সেই কাল্পনিক রোগগ্রস্ত নায়ক নয়, সেই সঙ্গে, সেই করতালির শব্দ শুনতে শুনতে মলেয়ারও দেহত্যাগ করেন।
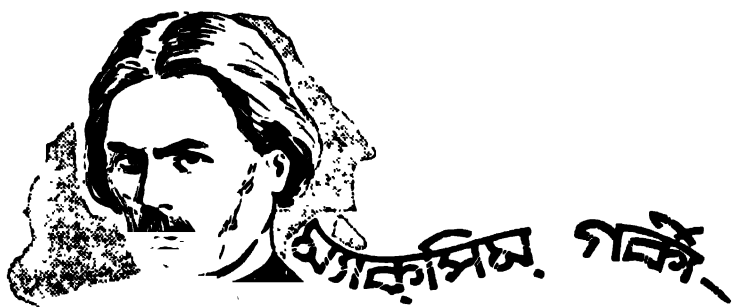
এক

ম্যাক্‌সিম্ গর্কী নিজে চারখানি অপূর্ব্ব আত্ম-চরিতে তাঁহার জীবন-কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্ম-চরিত তিনি নিজে যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারই ভাষায় সেইখান হইতেই আরম্ভ করা যাক,—

"মনে পড়ে, একটি ছোট্ট অন্ধকার ঘরে ঠিক জানালার নীচে আপাদ-মস্তক এক বিচিত্র দীর্ঘ সাদা পোষাক পরিয়া বাবা শুইয়া ছিলেন। খালি পা, হাত দুইটি বুকের উপর ক্রসের মত রাখা। বড় বড় সাদা দাঁতগুলি অন্ধকারে ঝলমল করিতেছিল।...

মা পাশে বসিয়া একটা চিরুণী দিয়া তাঁহার দীর্ঘ চুল আঁচড়াইয়া দিতেছিলেন। মনে পড়ে, তিনি কাঁদিতেছিলেন। অনবরত তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল।...কিছুক্ষণ পরে আমার ঠাকু'মা আসিয়া

আমাকে তুলিয়া বাবার পাশে বসাইলেন। বলিলেন, 'একবার বাবা বলে ডাক্! আর তো ডাকতে পারবি না।—ডাকলেও আর সাড়া পাবি না!'

জীবনের প্রথম স্মৃতি সেই মনে পড়ে।

এক দরিদ্র মিস্ত্রীর ঘরে ১৪ই মার্চ্চ, ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে নিজনী নভগোরড্ সহরে অ্যালেক্সী ম্যাক্সিমোভিচ পেয়স্কভ্ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে একমাত্র অধিকার এই নামটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া "গর্কী"-নাম গ্রহণের মধ্যে তাঁহার বেদনাতিক্ত জীবনের রূঢ়তম অভিজ্ঞতার ইতিকথা রহিয়া গিয়াছে।

জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বুঝিতে হইয়াছিল, তিনি অনাথ।

পিতার মৃত্যুর পর, তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল, তাহার দিদিমা। কারণ, মা পুনরায় বিবাহ করেন। এই অনাথ বালকটির প্রতি বৃদ্ধার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল এবং গর্কীর প্রথম আত্ম-চরিত 'মাই চাইল্ডহুড (My Child-hood)' পড়িলে বুঝা যায় যে, সেই বালকটিকে বৃদ্ধার প্রয়োজনও ছিল, কারণ বৃদ্ধার যেমন বেশী কথা বলার অভ্যাস ছিল, গর্কীও ছিলেন তাঁহার তেমনি ভক্ত শ্রোতা। অফুরন্ত ছিল বৃদ্ধার গল্পের ভাণ্ডার, পরীর বা রাজকুমারের গল্প নয়, প্রতিদিনের মানুষের গল্প। শিশু গর্কী নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সেই সব অদ্ভুত মানুষের গল্প শুনিত। বালকের চিত্তে অসাধারণ কৌতূহলের সঙ্গে সেই বালককালেই মানব-চরিত্র সম্বন্ধে বিস্ময়কর সব প্রশ্ন জাগিয়া উঠিত। শ্রোতার মানসিক অভিজ্ঞতার দিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বৃদ্ধা তাঁহার অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিয়া যাইতেন। তাহার

উপর বৃদ্ধার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, সুবিধা পাইলেই চায়ের মত ভোড্কা পান করিতেন।

একদিন বালক প্রশ্ন করিয়া বসিল, তুমি অত মদ খাও কেন ?

চায়ের কেট্লীতে লুকানো ভোড্কা আর এক চুমুক খাইয়া বৃদ্ধা বলিলেন, কিছু না ! কেন খাই, তুই যখন বড় হবি তখন বুঝতে পারবি ! তারপর শোন···আজ কি গল্প বলব বল্···

—আমার বাবার কথা বল।

—তোর বাবার কথা ? কোন দিন বলি নি তোকে—আজ বলি শোন। তোর বাবার যিনি বাবা ছিলেন, তিনি সৈনিকের কাজ করতেন। খুব জবরদস্ত লোক ছিলেন। নিজের চেষ্টায় তিনি সামান্য সৈনিক থেকে অফিসর হয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁর ব্যবহার বড় নিষ্ঠুর ছিল। তাঁর অধীন লোকদের সঙ্গে তিনি বড় রূঢ় ব্যবহার করতেন। সেই জন্যে তাঁর কঠোর শাস্তি হয়। তাঁকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। সেইখানে সাইবেরিয়ায় তোর বাবার জন্ম হয়। বড় কষ্টেই তার শৈশব কাটে। বাড়ী থেকে সে প্রায়ই পালিয়ে পালিয়ে যেত। পালালেই তার পেছনে কুকুর লাগিয়ে দেওয়া হ'তো···যখন তার বয়স ষোল, তখন সে এই নিজ্নী সহরে আসে। ছুতোরের কাজ শেখে···মেলায় অন্ধ লোকদের নিয়ে যেত···কিছু কিছু পেত··· তাই দিয়েই তার দিন চলত···ক্রমে ক্রমে সে ছুতোরের কাজে খুব উন্নতি করল···আসবাব-পত্র তৈরী করার এক কারখানায় চাকরী পেল।

যে কারখানায় সে কাজ করত, তারি ঠিক পাশে ছিল আমাদের বাড়ী। মাঝখানে একটা বেড়া। বেড়ার ওপারে খানিকটা বাগান,

সেই বাগানের ভেতর ছিল আমাদের বাড়ী। তখন আমাদের অবস্থাও ছিল বেশ ভাল।···একদিন সেই বাগানে তোর মা আর আমি জাম কুড়োচ্ছিলাম। এমন সময় দেখি, একটা লোক বেড়া ডিঙ্গিয়ে হন্ হন্ করে আমাদের দিকে ছুটে আসছে···আমার তো ভীষণ ভয় হয়ে গিয়েছিল। ভেরিয়ার দিকে চেয়ে দেখি, মেয়েটা হাসছে···

লোকটা সামনে এগিয়ে আসতে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন অভদ্র ছোকরা হে তুমি? বেড়া ডিঙ্গিয়ে এখানে কি করতে তুমি এসেছ?

হঠাৎ লোকটি আমার সামনে নতজানু হয়ে মিনতি করে বলে উঠল, 'আকুলিনা, আমার মন এখানে পড়ে আছে···তাই আমি এসেছি ···ভেরিয়াকে আমি বিয়ে করতে চাই···আর বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত হবে না'···তিনিই হলেন তোমার বাবা! বিয়ে হল, কিন্তু তোমার ঠাকুর্দ্দার অমতে। তিনি মেয়ে জামাই-এর মুখ দর্শন করলেন না।

গর্কীর মা দ্বিতীয়বার বিবাহ করার পর গর্কী দিদিমার কাছেই থাকিতেন। এধারে তাঁহাদের অবস্থা প্রতিদিনই শোচনীয়তর হইয়া আসিতেছিল। তাহার উপর বুড়া-বুড়ীর মধ্যে নানা কারণে প্রায়ই ঝগড়া হইত। কোন কোন সময় বৃদ্ধ বুড়ীকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতেন। বালক স্তম্ভিত বিস্ময়ে সমস্ত দেখিত, শুনিত। "মাদারের" লেখকের শৈশবে কোনও পরীর গল্প শুনিবার সুবিধা হয় নাই, কোনও একটি খেলার পুতুল তাঁহার হাতে পড়ে নাই।, যে-কবি নিষ্পেষিত, মূক মানবতাকে নব-মন্ত্রে সঞ্জীবিত করিয়া বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে, ক্ষত্রিয়-বিশ্বামিত্রের মত মানবতার এক স্বর্গলোকের সৃষ্টি

করেন, শৈশবেও তাঁহার মনে কোন শিশু ছিল না। তাঁহার শৈশব-কাহিনী পড়িতে পড়িতে প্রায়ই মনে হয়, যেন বিরাট তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে সঙ্গীহারা এক শিশু একা চলিয়াছে···উদাসীন মাতা জনতায় তাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে···পারিপার্শ্বিকতার সুগভীরতার মধ্যে, ভয়ে সে বিকল হইয়া গিয়াছে···চোখে তাহার অশ্রু নাই···মুখে বাণী নাই···ভীত হইবার অনুভূতি পর্য্যন্ত তাহার নাই···

তাঁহার বহু গল্পে, বিশেষতঃ 'দি স্পাই (The Spy)' নভেলে এবং 'নিলুস্কা (Nilushka)' গল্পে বিমর্দ্দিত শৈশবের এই অনন্যসাধারণ চিত্র অবিনাশী রেখায় অঙ্কিত আছে। তাঁহার সাহিত্যে এই ধরণের শিশুর দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়ে গর্কী অপূর্ব্ব কৌশলে জীবনের রূঢ়তা, পঙ্কিলতা এবং অর্থহীনতা এমন সুগভীরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, সেই সব অনাচারের বিরুদ্ধে তিরস্কার এবং প্রতিবাদ আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। এই বিষয়ে একমাত্র যে লেখকের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তিনি হইলেন অলিভার টুইস্টের জন্মদাতা ডিকেন্স।

সেই শিশু তিনি ছিলেন নিজে। বালক এমনই গম্ভীর ও উদাসীন হইয়া থাকিত যে, একদিন তাঁহার বৃদ্ধ মাতামহ জিজ্ঞাসা করেন, "এই, তুই এমনি চুপ করে বসে থাকিস্ কেন ?"

বালক বলিয়াছিল, "এমনি চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে ! কেন আবার ?"

বালকের মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ আপনার মনে বলিত, "আমরা

ভদ্দরলোক নাই। আমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে কারই বা মাথাব্যথা পড়বে! ওদের ছেলেদের জন্যে স্কুল হয়, বই লেখা হয়, আমাদের ছেলেদের কে দেখে বল? আমাদের পথ আমাদেরই করে নিতে হয়!"

গর্কীকেও তাঁহার নিজের পথ নিজেকেই করিয়া লইতে হইল।... কিছুকাল পরে তাঁহার মাও পরলোক গমন করিলেন।...সংসারে দুইজন বৃদ্ধলোক ও একটি শিশু। দুইজন বৃদ্ধের খাদ্যের সংস্থান হয় না... বালককে কে দেখিবে?

একদিন বৃদ্ধ পিতামহ বালক গর্কীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, এইবার তুমি পথ দেখ, তোমাকে আর আমি খাওয়াতে পারব না।"

সেই দিনই বালক "পথ দেখিতে" রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। বিপুল বিশ্বে সম্পূর্ণ ভাবে একা। সেইখান হইতে বালক চলিতে আরম্ভ করিল, রুষিয়ার এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত, মানব-চিত্তের তীর্থে তীর্থে...

এইখান হইতেই তাঁহার সুবিখ্যাত দ্বিতীয় আত্মচরিত 'ইন্ দি ওয়ার্ল্ড (In the world)'-এর সূচনা।

পুরাকালে যে সমস্ত নাবিক সমুদ্রপথে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারিতেন, তাঁহারা অবিনাশী কীর্ত্তির অধিকারী হইতেন। গর্কী সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি, বেদনার লবণাম্বুধি বহিয়া মানব-অভিজ্ঞতার বিশ্ব সমগ্র ভাবে তাঁহাকে পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্যে তাই বেদনা-সিন্ধুর সুদূরতম উপকূলের তরঙ্গধ্বনি স্পষ্টভাবে শুনিতে পাই। তাঁহার পূর্ব্বে বেদনা-

সিন্ধু-বেষ্টিত বিশ্বের মানচিত্রের বহু স্থান অপূর্ণ এবং অপরিজ্ঞাত ছিল, তাঁহার সাহিত্যে তাহার পূর্ণ মানচিত্র পাওয়া গেল।

কুলী, মুটে, মজুর, চাকর যখন যে ভাবে পাথেয় জোটে, সেই ভাবে বালক পথ চলিতে আরম্ভ করিল। গৃহ নাই, শুধু আছে পথ। মাঝখানে ভল্গা নদীর এক জাহাজে "বয়"-এর চাকরী জুটিল। 'স্মেয়ার (Smaire)' নামে এক বাবুর্চ্চির সঙ্গে থাকিতে হয়। সেইখানেই বাবুর্চ্চির কাছে তাহার প্রথম পুস্তক-পরিচয়। বালক পড়িতে আরম্ভ করিল। স্মেয়ারের দুইখানি বই ছিল, একটি 'লাইভস অব সেন্টস (Lives of Saints)' আর একটি 'গোগোল (Gogol)'-এর গ্রন্থাবলী। গোগোলের গল্প বালকের মনকে নাড়া দিল।

তারপর সে চাকরীও গেল। আবার পথে। এক শহর থেকে আর এক শহরে অবজ্ঞাত জীবনের এক স্তর থেকে আর এক স্তরে, কখনও অনাহারে, কখনও অর্দ্ধাহারে, কখনও দুয়ারে, কখনও রুষিয়ার সীমাহীন তেপান্তর-মাঠে শার্দ্দূলসংকুল নৈশ অন্ধকারে…

"তখন ডোবরিঙ্ক স্টেশনের মালঘরে রাত্রিবেলা চৌকিদারের কাজ করি। সন্ধ্যা ছয়টা হইতে সকাল ছয়টা পর্য্যন্ত লাঠি-হাতে মালঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াই। দিগন্তপ্রসারী মাঠে নৈশ অন্ধকারে উন্মাদ ঝড়ো-হাওয়া বহিয়া যাইত, বাতাসে তুলার মত তুষার ছড়াইয়া পড়িত।

মাঝে মাঝে একান্ত মন্থর গতিতে তুষার ভেদ করিয়া, কোনও রকমে পিছনের মালগাড়ীগুলিকে টানিয়া লইয়া এঞ্জিন সশব্দে যাতায়াত করিত। তুষার-পঙ্কিল নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা ক্লান্ত

কাতর একঘেয়ে শব্দ জাগিয়া উঠিত, মনে হইত, কে যেন পৃথিবীকে বেস্টন করিয়া সারারাত্রি ধরিয়া লৌহশৃঙ্খল পরাইতেছে।

একদিন দেখি আধ-অন্ধকারে মালঘরের এক কোণে তুষারের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে দুইটি লোক দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই তুষারের আড়ালে তাহারা লুকাইয়া পড়িল। কসাক! মালঘর হইতে ময়দা চুরি করিতে আসিয়াছে।

অন্ধকারে শুনিলাম, ভিক্ষুকের মত কণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ করিয়া কে কি ভিক্ষা চাহিতেছে। কোনও সাড়া না পাইয়া সেই কণ্ঠ পুনরায় অর্দ্ধ-রুবেল ঘুষের কথা জানাইয়া দিল।

উত্তর দিলাম, ও সব আমার কাছে হবে না।

তারপর আর সাড়াশব্দ নাই। সেই রাত্রির অন্ধকার আর সেই তুষারবাহী নৈশ-ঝঞ্ঝা। আমি জানি যে, এই সব লোক পেটের দায়ে চুরি করিতে আসে নাই—তাহারা আসিয়াছে ভোড্‌কা এবং তাহাদের কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অর্থ সংগ্রহ করিতে।

সেই সময় আমার চারিপাশে যে সমস্ত বিচিত্র নরনারী ক্ষণিক পরিচয়ের আলোকে আমার অন্তরে নানা রূপের ছায়াপাত করিয়া যাইত, তাহারা জানিত না যে, সেই ছায়া-মরীচিকার মধ্যে আমার চিত্ত কোন্ নিগূঢ় আলোকতত্ত্বের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার প্রয়াসে বেদনায় নিত্যসংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত।

মানুষকে জানিবার উদগ্র বাসনা তখন তীব্র নেশার মত আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। আমার চারিদিকে দেখিতাম, কি বিরাট সংগ্রাম চলিয়াছে, মানবে আর পশুতে।

ডোবরিঙ্ক ষ্টেশনের জীবন আমার পক্ষে ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল। চেষ্টা করিয়া অন্য এক ষ্টেশনে চটের বস্তা, ত্রিপল ইত্যাদির জমা-খরচ রাখিবার চাকুরী পাইলাম।

চটের বস্তা আর ত্রিপল পাহারা দিতে দিতে মন আমার স্বপ্ন দেখিত, সুন্দরতর জীবনের, মহত্তর অস্তিত্বের। রাত্রিবেলায় পকেট হইতে শেক্স্পীয়ার এবং হাইনের পুরাণো গ্রন্থাবলী বাহির করিয়া পড়িতাম। সেই উদাসীন নিস্তব্ধতার মধ্যে শেক্স্পীয়ার পড়িতে পড়িতে সহসা মন উদাস হইয়া উঠিত; অর্থহীন বদ্ধ দৃষ্টি লইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। অন্ধকারে মনে হইত, আমার চারিদিক দিয়া মৃত মানবের অনন্ত, অশ্রান্ত কল্লোল চলিয়াছে, লক্ষ চিত্তের অপ্রকাশের মৌন ব্যথায় রুষিয়ার রাত্রি এক অপরূপ নিঃশব্দতার করুণ রাগিণীতে ভরিয়া উঠিত···

মানুষকে অতি কুৎসিত রূপে দেখিয়াছি, এত কুৎসিত যে, তাহাকে ঘৃণা না করিয়া পারা যায় না; কিন্তু তবু'ও মনে হয়, মানুষের চেয়ে পবিত্র এবং মহৎ অন্য কিছু আর বিশ্ব-পরিকল্পনায় নাই। মানুষের অন্তরে আছে এক অপরূপ মৃত-সঞ্জীবনী, যাহার ফলে একই জীবনে লক্ষ মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া জীবনের অমৃত আস্বাদ সে ভোগ করিতে পারে—"

ম্যাক্সিম্ গর্কীর জীবনী এবং সাহিত্য সেই কথাই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

দুই

এই ভাবে গর্কীকে শিশুকাল হইতে পরিণত যৌবন পর্য্যন্ত পায়ে মাপিয়া সমস্ত রুষিয়াকে পরিক্রম করিতে হইয়াছে। শুধু পথে প্রান্তরে নয়, মন থেকে মনে পরিব্রাজক রূপে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তাই তাঁহার অপূর্ব্ব আত্ম-চরিতে আমরা পাই মানবচিত্ত-তীর্থের অপূর্ব্বতর পরিচয়। শিশুকাল হইতে তিনি মানব-মনের এক তীর্থ হইতে আর এক তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন, যত দূর-দুর্গম সে তীর্থ হউক না কেন। অধিকাংশ লোক যেখান হইতে ব্যর্থ হইয়া, অথবা ঘৃণায় বা ভয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, তিনি করুণা ও স্নেহ-সঞ্জীবিত শিখা হাতে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন —দুর্গমতার অবরোধের মধ্যে দেবতাকে দেখিয়াছেন।

কোন স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন শিক্ষা তিনি পান নাই। প্রথম যৌবনে কাজান-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য কয়েকদিন চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরের যাযাবর প্রবৃত্তি টানিয়া তাঁহাকে পথে দাঁড় করাইল। কিন্তু তিনি জগতের সব চেয়ে বড় শিক্ষকের নিকট হইতে দীক্ষা লইয়াছিলেন, সে শিক্ষক হইল জীবন। তাহার শিক্ষার মধ্যে ভুল কিছু নাই, ভুলিবার কিছু নাই। তাই তাঁহার যৌবনদিনের আত্মচরিতের নাম দিয়াছিলেন, 'মাই য়ুনিভারসিটি ডেজ্ (My University Days)'।

টিফ্লিস্ রেলের ষ্টেশনে কাজ করিতে করিতে তাঁহার মনে কাব্য

ম্যাক্‌সিম্‌ গর্কী রাত্রে মাঝের ঘরের কোণে তুইটি লোককে দেখিতে পাইলেন।

বা কবিতায় তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিবার বাসনা জাগে। তিনি কাজের অবসরে অবসরে আপনার মনে কবিতা লিখিতেন। হঠাৎ একবার এই সময় বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার সন্দেহে তিনি কারারুদ্ধ হন। কয়েক দিন হাজত-বাসের পর পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে জেনারেল পোস্নানস্কির সম্মুখে আনা হইল।

পরীক্ষার ফলে আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া গেল না—শুধু সেই কবিতার খাতাখানি। জেনারেল পোস্নানস্কি খাতাটি খুলিয়া কবিতাগুলি পড়িলেন। তারপর বন্দীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, মন্দ নয়, কবিতাগুলির মধ্যে জিনিস আছে। তা তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। যদি লিখতে-টিখতে চাও, কবিতার খাতাখানি নিয়ে করোলেন্কোর কাছে যাও, টুর্গেনিভের চেয়ে কোন অংশে কম নয়···

সেখান হইতে মুক্ত হইয়া গর্কী সৈনিক হইবার জন্য সেনা-অফিসে আসিলেন। তাহারা পরীক্ষা করিয়া বলিল, অচল, তোমার সর্ব্বাঙ্গ ছেঁদা। তোমার ফুস্ফুস্ ফুটো!

সেখান হইতে আবার পথে। কখনও কুলী, কখনও বেয়ারা, কখনও মজুর!

অবশেষে একদিন কবিতার খাতাটি লইয়া করোলেন্কোর বাড়ীর সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর সামনেই একজন মোটামতন লোক দাঁড়াইয়া ছিল। দরজার নিকট অগ্রসর হইতেই লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, কাকে চাই?

—করোলেন্কো-কে।

—আমিই করোলেন্কো।

…বাইরে তিন দিন অনবরত তুষার পড়িয়াছে। নিদারুণ শীত। আগন্তুক তরুণ কবিকে ঘরে লইয়া গিয়া আগুনের সামনে বসাইলেন।

—ইস্! এ কি কাণ্ড! এই দারুণ শীতে, তোমার গায়ে যে জামা নেই বললেই চলে।

যশের মন্দিরে যিনি পৌঁছাইয়াছেন, তিনি হাত বাড়াইয়া মন্দিরের আর এক যাত্রীকে তুলিয়া লইলেন।

—তা নিশ্চয়ই পড়ব। খাতাখানা রেখে যাও। বুঝলে? হাতের লেখাটা তোমার বড় বিচিত্র তো, স্পষ্ট বটে, কিন্তু পড়তে কষ্ট লাগে। বানানের দু'একটা ভুল দেখছি…তাড়াতাড়ি লেখা বোধ হয়, এই যে zigzagএর যায়গায় zizgag লিখে ফেলেছ! এই যে কতকগুলি কথা ভুল বসিয়েছ…তা হোক্…

হঠাৎ তরুণ কবির মুখের দিকে চাহিয়া করোলেন্‌কো বলিয়া উঠিলেন, তা এ রকম সকলেরই হয়। উস্‌পেন্‌স্কীর নাম শুনেছ তো? কত বড় সাহিত্যিক তাঁর কাণ্ড শোনো…

তরুণ কবি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে করোলেন্‌কোর বাসনা অনুযায়ী গর্কী তাঁহার গদ্য-রচনার খাতা তাঁহার কাছে রাখিয়া আসিলেন। দুই দিন পরে সেই সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

দুইদিন পরে গর্কী আবার তাঁহার দ্বারে আসিলেন। দেখিলেন, সামনের সিঁড়িতে করোলেন্‌কো মস্ত বড় এক কুঠার হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

গর্কীকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই, তোমার লেখা কাটবার জন্য এ যন্ত্র নয়। তোমাকে লিখতে হবে···রুষ সাহিত্য তোমাকে চায়···

সেদিন বিদায়ের সময় করোলেনকো বলিলেন, তা হলে,···যা বললাম, একটা সত্যিকারের পূরো গল্প, বড় গল্প লেখা চাই-ই···

সেইদিনই বাড়ী আসিয়া গর্কী "চেলখাস্" লিখিয়া ফেলিলেন। "চেলখাস্" পড়িয়া করোলেনকো আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। সেই অপূর্ব্ব গল্পটি পড়িয়া সেদিন করোলেনকো গর্কীর সাহিত্য-রচনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, অল্প-কথার মধ্যে গর্কীর সাহিত্য সম্বন্ধে তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচনা বলা যাইতে পারে।

গর্কীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন,

"You know to create characters, the people with you speak and act for themselves from their own essence, you manage not to mix in the steam of their thought the game of their feelings. Not everyone succeeds in this! And the best thing of all is that you appreciate a man such as he actually is."

করোলেন্‌কো নিজে উদ্যোগী হইয়া রুষিয়ার সেই সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্র Russkoje Bogatstvo-র প্রধান রচনা হিসাবে গল্পটি প্রকাশিত করাইলেন। "চেলখাস্" প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। রুষিয়ার সাহিত্যিকমণ্ডলী স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, আর এক নূতন সূর্য্যের উদয় হইতেছে।

একটার পর একটা গল্প প্রকাশিত হইতে লাগিল। বেদনাশীর্ণ,

বঞ্চিত, পরিত্যক্ত, মূক-মানবতা আত্মপ্রকাশের নবভাষা, নব-ছন্দ খুঁজিয়া পাইল। 'দি লোয়ার ডেপ্থস্ (The Lower Depths)' নাটক প্রকাশিত হইবার পর গর্কীর নাম সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িল। জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রযোজক ম্যাক্স্ রাইন্হার্ট বার্লিনে 'দি লোয়ার ডেপ্থস্ (The Lower Depths)'-এর প্রযোজনা করিলেন। উপর্য্যুপরি পাঁচশো রাত্রি এই অভিনয় হয়।

বঞ্চিত, সর্ব্বহারা মানুষের প্রতি তাঁহার দরদ শুধু লেখনীমুখেই ছিল না।

চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন এক দিক্ দিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে নব-জাগরণের প্রাণ-বস্তুকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছিলেন. কর্ম্ম-ক্ষেত্রেও তেমনি সাক্ষাৎ ভাবে রাজনীতির মধ্যে তিনি রুষিয়ার গত যুগের মুক্তি-আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে যোগদান করেন। ১৯০৫ সালে রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ হন, কিন্তু তাহার পরের বৎসরেই ছাড়া পান। মুক্ত হইয়াই তিনি জার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য চালাইবার জন্য আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে গমন করেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি বিপন্ন হইয়া পড়েন। তাঁহার বিরুদ্ধে একদল লোক এমনভাবে জনমত গঠন করিয়া তোলে যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। খবরের কাগজগুলি ঘোষণা করিতে লাগিল যে, গর্কী এ্যানার্কিষ্ট, আমেরিকায় এ্যানার্কিজম্ প্রচার করিতে আসিয়াছে। অবস্থা এমন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে, যুক্ত-রাষ্ট্রের আদালতের একজন প্রধান বিচারপতি গর্কীর নাম শুনিয়াই বলিয়াছিলেন, "That man ought to have been kicked out of the country."

যুক্ত-রাষ্ট্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ক্যাপরিতে বসবাস স্থাপন করিলেন। যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন উত্তেজনায় অন্য সব লোকের মত তিনিও সৈন্যরূপে যুদ্ধে যোগদান করেন। গ্যালিসিয়ার যুদ্ধে বিশেষভাবে আহত হওয়ায় তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া তিনি বোল্‌শেভিক আন্দোলনে যোগদান করিলেন। তাঁহার প্রাণময়ী অপূর্ব্ব ভাষায় তিনি জনগণের মধ্যে সাম্যবাদের নীতি প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা বিষয়ে ক্রমশঃ লেনিনের সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটিতে আরম্ভ হইল। বোল্‌শেভিক অভ্যুত্থানের প্রথম দিকে ক্ষিপ্ত জনতার অনাচার যখন বোল্‌শেভিক নেতাদের সম্মতিতে আরও ইন্ধন লাভ করিতে লাগিল, তখন গর্কী ভয়লেশহীন তীব্র বাণীতে তাহার প্রতিবাদ ঘোষণা করিলেন। তাঁহার সংবাদপত্রের প্রচার তদানীন্তন বোল্‌শেভিক গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আর কোনও দণ্ড দিতে বোল্‌শেভিক গভর্ণমেণ্ট সাহস করিল না, কারণ তখন নিপীড়িতদের মর্ম্মউদ্‌গাতা হিসাবে গর্কীর নাম প্রত্যেক লোকের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। বহুদিনের বহু অনাচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেদিন রুষিয়ায় ক্ষিপ্তপ্রায় জনতা প্রথম মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—সেদিন সকল বিচার, সকল বিবেচনা ভুলিয়া, এক অন্ধ উন্মত্ত আবেগে, সে শুধু আঘাত হানিয়া চলিল,—সকল কিছুর উপর, যাহারই সহিত তাহার ধারণা হইল অত্যাচারকারীদের সম্পর্ক ছিল বা থাকিতে পারে। কোন দিন কোন শিক্ষার সুবিধা তাহারা পায় নাই—তাহাদের ধারণা এবং বোল্‌শেভিক প্রচারে সেই ধারণা

আরও বদ্ধমূল হয় যে,—শিল্প, কলা, সাহিত্য সমস্তই হইল অত্যাচারকারী অভিজাত শ্রেণীর লোকদের শুধু বিলাসের সামগ্রী, তাহাদের বেদনার প্রতি উদাসীনতার এবং উপহাসের জীবন্ত প্রমাণ, অতএব অত্যাচারকারীকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে, আঘাত কর সব কিছুকেই, যাহাকে তাহারা প্রিয় বলে, সুন্দর বলে। ইহাই হইল তখন ক্ষিপ্ত জনতার একমাত্র কথা এবং বোল্‌শেভিক নেতারাও সেই এক যুক্তিই আরও তীব্র করিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছিল। তাহার ফলে, সমগ্র রুষিয়ার মধ্যে এক অতি কুৎসিত এবং ভয়াবহ শিল্প-হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। দিকে দিকে লাইব্রেরী পুড়াইয়া ফেলা হইতে লাগিল, বড় বড় শিল্প-আগার হইতে ছবি মাটীতে টানিয়া ফেলা হইল, শিল্প-মূর্ত্তি হাতুড়ির আঘাতে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া-গুঁড়া করিয়া ফেলা হইল এবং সেই ধ্বংস-কাণ্ডের মধ্যে ক্ষিপ্ত জনতা এক অনাস্বাদিত আত্ম-প্রসাদ লাভ করিল। সেই ভয়াবহ অনাচারের বিরুদ্ধে, জনতার সেই ক্ষিপ্ত মূঢ়তার বিরুদ্ধে, সেদিন রুষিয়ায় কাহারও প্রতিবাদ-বাণী জাগে নাই, জাগিতে সাহস করে নাই ; শুধু একমাত্র সেদিন গর্কীর কণ্ঠে সেই অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র বাণী জাগিয়া উঠিল। তাঁহার সৃজন-শীল আত্মা সেই মূঢ়তার ভয়াবহ আত্ম-প্রকাশে শিহরিয়া উঠিল। তিনি প্রতিবাদ করিলেন। কোন্ পুস্তকে মনে নাই, গর্কীর সেই সময়কার একখানি ফটোগ্রাফ দেখিয়াছিলাম, স্তূপীকৃত ছিন্ন পুস্তক আর বিমর্দ্দিত চিত্রের মধ্যে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, দৃষ্টিতে মনে হয়, জগতের সব চেয়ে বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তাঁহার চক্ষু প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ শিল্প হইতে আক্রোশ শিল্পীদের উপরেও

গিয়া পড়িল। এই সময় বহু রুষীয় পণ্ডিত এবং গুণীকে অকারণে হত্যা করা হয়। গর্কী প্রকাশ্যভাবে লেনিনকে উদ্দেশ্য করিয়া এই সম্পর্কে একটি পত্র লিখিয়া প্রকাশিত করেন। সেই তীব্র প্রতিবাদের ফলে বোল্‌শেভিক নেতাদের দৃষ্টি এই বীভৎস অনাচার প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থার দিকে নিপতিত হয় এবং গর্কী স্বয়ং সেই মহাদায়িত্ব গ্রহণ করেন। সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি অসহায় সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিকদিগের সেবার ভার গ্রহণ করেন। বোল্‌শেভিক অভ্যুত্থানের প্রথম উন্মাদনার মুখে, যাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ক্ষিপ্ত রাক্ষসের মত জনতা আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, গর্কী তাঁহার তপস্যাগূঢ় একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা সেই শিল্প এবং সাহিত্য-মহিমাকে নবজীবন দান করিয়া বোল্‌শেভিক অভ্যুত্থানের এক মহা-লাঞ্ছনাকে দূরীভূত করিলেন। পেট্রোগ্রাড শহরে তিনি "House of Savant" নামে স্টেটের অর্থে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। মানসিক শিক্ষার এবং কৃষ্টির অপমৃত্যু হইতে এই প্রতিষ্ঠান সেদিন রুষিয়াকে রক্ষা করে। সমগ্র রুষিয়া হইতে লেখকদিগকে সমবেত করিয়া গর্কী তাঁহাদের জাতির সাহিত্যভাণ্ডার-বৃদ্ধির সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। যাহাতে রুষিয়ার প্রত্যেক লোক সকল দেশের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির সহিত মাতৃভাষায় পরিচিত হইতে পারে, তাহার বিরাট আয়োজন করিলেন এবং বিপ্লবের সেই বিক্ষিপ্ততা হইতে তিনি আবার এক অপূর্ব্ব নব-সৃজনের মানসিকতাকে দৃঢ় এবং সংহত করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। বারট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) তাঁহার বিখ্যাত 'থিয়োরি এণ্ড প্র্যাক্‌টিস অব বল্‌শেভিজ্‌ম (Theory & Practice of

Bolshevism)' গ্রন্থে গর্কীর এই সময়কার চিত্র দিয়াছেন, "সমস্ত রুষিয়ার মধ্যে এই একটি মানুষকে (গর্কীকে) দেখিলাম—যিনি সাহিত্য এবং শিক্ষাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। হয়ত গর্কীর সঙ্গে সঙ্গে রুষ-সাহিত্য এবং শিক্ষাও বিদায় লইবে।" অবশ্য রাসেলের সে আশঙ্কা অমূলক হইয়া গিয়াছে, তাহা আজ আমরা জানি।

বোল্‌শেভিক অভ্যুত্থানের গোড়ার দিকে রুষিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে রকম দুর্ভিক্ষ সমগ্র জগতের ইতিহাসে খুব কমই হইয়াছে। সেই সময় গর্কী দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য-সংগ্রহের জন্য এবং রুষিয়ার সেই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে জগতকে সচেতন করিবার জন্য ১৯২১ সালে য়ুরোপ পরিভ্রমণে বাহির হন। এই কার্য্যে তিনি বেশী দূর সফল হইতে পারেন নাই, নানাভাবে নানা বাধা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে; তাহার উপর তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফুসফুসের গোলমাল অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। তাঁহার আর রুষিয়া প্রত্যাগমন করা হইল না। চিকিৎসার জন্য প্রাগ শহরে রহিলেন—সেখান হইতে ইতালীর ক্যাপরী দ্বীপে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ১৯২৬ সালে হৃত স্বাস্থ্য কথঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়া তিনি য়ুক্রায়েন্ (Ukraine) অঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশে কিছুদিন বাস করিলেন। সাত বৎসরের পর ১৯২৮ সালে তিনি পুনরায় রুষিয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু মস্কোতে কিছুকাল থাকার পর শরীর আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসেই তিনি ক্যাপরীতে চলিয়া আসিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াই তিনি ১৯২৯ সালের জুন মাসে রুষিয়ায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহার প্রত্যাগমন

উপলক্ষে সমগ্র রুষিয়া এবং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিপুল ভাবে অভিনন্দিত করে। তাঁহার জন্মভূমি নিজনী-নভগোরড্ তাঁহারই নাম অনুসারে গর্কী নামে পরিবর্ত্তিত হইল—তাঁহার নামে সোভিয়েট ষ্টেট সাহিত্য-সম্পর্কে পাঁচটি বৃত্তির আয়োজন করিল। গর্কীর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার জন্য সোভিয়েট তন্ত্রের বিরুদ্ধচারীরা প্রচার-আন্দোলন চালাইতে বিরূপ হন নাই। গর্কীর প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে রুষিয়ার শ্রমিকগণ তাঁহাকে যে অভিনন্দন-লিপি প্রদান করে, তাহাতে সেই বিরুদ্ধচারীদের লক্ষ্য করিয়া তাহারা বলে,—

"The Labouring masses of the U. S. S. R. will not let any one offend Gorki—their own Gorki ! Hands off Gorki !"

যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তিনি ছিলেন সত্যই তাহাদের নিজের—"Their own Gorki". কোথায় আল্ডানের (Aldan) স্বর্ণখনি, কোথায় সারফুকুর (Serphukoo) শ্রমিকসঙ্ঘ, কোথায় য়ুক্রায়েন্ পর্ব্বতের কোলে একজন তরুণ সাহিত্যিক—রুষিয়ার সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর লোক মনে করিত, গর্কী তাহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বন্ধু। তাই প্রত্যেকে তাঁহাকে চিঠি লিখিত, জীবনের প্রতিদিনের অতি তুচ্ছ সাংসারিক সমস্যা-সমাধানের ব্যবস্থা হইতে, মানসিক আবর্ত্তনের পথ নির্দ্ধারণ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে তাঁহার উপদেশ কামনা করিয়া এবং তিনি নিজের হাতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত "ফুটো ফুস্ফুস্" লইয়া প্রত্যেকের চিঠির জবাব দিতেন। এই সম্পর্কে 'সোভিয়েট কালচার বুলেটিনে (Soviet Culture Bulletin)' প্রকাশিত হয় যে,—

"At a time when he is engaged in summing up the results of his great experience in a long novel, he still finds leisure, not only to respond to all the most important events of the day in his published letters, but also to carry on personal correspondence with a tremendous number of people. *Letters and answers fly back and forth like a flock of birds.* And not one of these letter ever remains unanswered."

জীবনকে তিনি যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, মানবকে তিনি যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, তাহাতে জীবন ও মানব সম্বন্ধে তাঁহার তীব্র বিরূপতা জাগিবার কথা; কিন্তু তাঁহার সাহিত্য এবং তাঁহার জীবনের ইহাই সব চেয়ে বড় কথা, রম্যা রোলাঁর ভাষায় বলিতে হয়, "To know life and yet to love it." জীবনের কোন রূঢ়তা, কোন ব্যর্থতা তাঁহার সেই মানব-প্রীতির বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটাইতে পারে নাই।

সাহিত্যে গর্কী কোন মানুষকে ফুটাইয়া তোলেন নাই। তাঁহার সকল রচনার মধ্য দিয়া তিনি একটি জিনিষকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যে-ব্যবস্থায় ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে বঞ্চিত জীবন যাপন করিতে হয়, সেই প্রাণহীন নির্ম্মম ব্যবস্থাকে তিনি সকল আবরণমুক্ত করিয়া তুলিয়া দেখাইয়াছেন। তাই তাঁহার রচনার মধ্যে নায়ক-নায়িকার অবস্থান-সংযোগে চির প্রচলিত কাহিনী-রচনার সংগঠন নাই। সাহিত্য-রচনার দিক হইতে মোপাসাঁর গল্প বলিতে আমরা যাহা বুঝি, গর্কীর গল্পে বা নভেলে রচনার সে রূপ নাই। সত্যকারের জীবন মোপাসাঁর গল্পের মত চলে না। গল্পে ঘটনা যে ভাবে সাজিয়া-

গুঞ্জিয়া আসে, জীবনে সে রকম আসে না। গর্কী চাহিয়াছিলেন সেই জীবনকেই তাঁহার গল্পের কেন্দ্র করিতে। এক অনির্দ্দিষ্ট ক্রুর ভবিতব্যতাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সৃজিত মানবগুলি, তাহাদের প্রয়োজন-মত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের যাওয়া-আসার ফলে, জীবনের সেই বিধিহীন নির্ম্মমতাই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

গর্কী তাঁহার সাহিত্যে দরিদ্র লোকদের নারায়ণ বলিয়া তাহাদের জন্য করুণা কুড়াইয়া বেড়ান নাই। মানুষের উদাসীনতা, অবজ্ঞা এবং অপ্রেমের ফলে মানুষ মানুষের কত বড় সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাঁহার লক্ষ্য একমাত্র সেই নির্ম্মম ব্যবস্থার দিকে। মানুষের মধ্যে তিনি রাক্ষসকে রাক্ষসরূপেই দেখিয়াছেন। তবে, সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তরে এই বিশ্বাস ছিল যে, তাহার জন্য সে দায়ী নহে এবং জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে, জীবনের প্রত্যেক স্তরে মিশিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাসই সত্য। জীবনে যাহাদের নীচ বলিয়া, দানব বলিয়া, পশু বলিয়া, সভ্য-সমাজ নির্ব্বাসন-ব্যবস্থার আয়োজন করিয়াছে, গর্কী দেখিয়াছেন যে, তাহা তাহাদের আসল রূপ নয়। অবশ্য, এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে সহসা মানবকে, মানবত্বকে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়, কিন্তু খুঁজিলে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। গর্কী চিরবঞ্চিত মানবদের নির্ব্বাসন-লোক তন্নতন্ন ভাবে পরিক্রমণ করিয়া মানবত্বের সেই অবশিষ্ট অংশটুকুকে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। মানবতার যে বিরাট অংশ আপনার ব্যর্থতার মধ্যে মূক হইয়া বিলীন হইয়া যায়, গর্কী তাঁহার সাহিত্যে তাহাদের

মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। গর্কীর সাহিত্যে আমরা দেখি, ধাত্রীর মত দুঃখ জীবনকে নিত্য দোলা দিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে, লেখকের বলিষ্ঠ হৃদয়ের মঙ্গল-কামনা বন্দনা-গীতের মত নিত্য আকাশের দিকে উঠিতেছে। সে বন্দনা বলে, তাঁহারই রচিত ইয়েভ্সীর (Yevsey) মত, "It will pass away—এ রাত্রি প্রভাত হবে।"
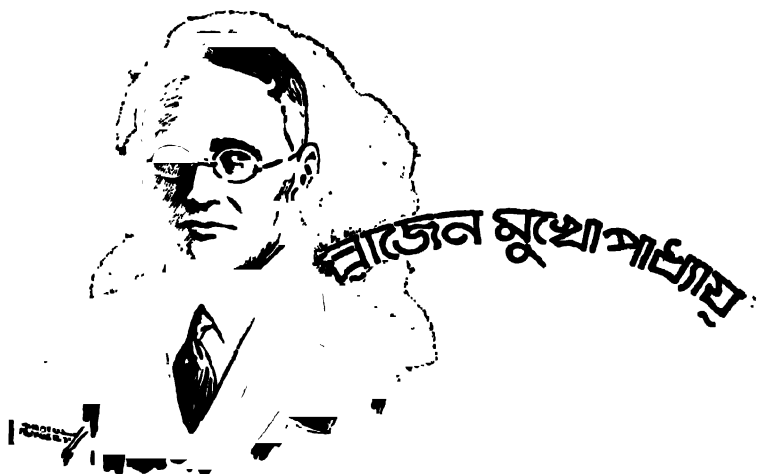
এক

ভাবলা গ্রাম। সেই গ্রামে আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগে, এক পাঠশালা ছিল।

সেই পাঠশালাতে একটা ছেলে পড়তো, নাম রাজেন্দ্রনাথ। পূরোনাম—রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। অন্য সব ছেলেদের মতই সাধারণ ছেলে; তবে পাঠশালার অন্য ছেলেদের সঙ্গে একটা বিষয়ে রাজেন্দ্রনাথের একটু তফাৎ ছিল। সেই পাঠশালার যিনি সেই সময় গুরুমশাই ছিলেন, মানসাঙ্ক শেখানোর দিকে তাঁর একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। মুখে মুখে যে-ছেলে যত তাড়াতাড়ি মানসাঙ্ক করতে পারতো, সে-ছেলে তাঁর তত প্রিয় হতো। মানসাঙ্কের নাম শুনলে অন্য ছেলেদের মুখ শুকিয়ে উঠতো; কিন্তু রাজেন্দ্রনাথের সেই সব মানসাঙ্ক কষতে খুব ভাল লাগতো। সব জিনিসটাই মুখে মুখে

করতে হতো এবং বড় বড় মানসাঙ্ক করতে হলে, খুব স্মরণ-শক্তি থাকা চাই। মানসাঙ্ক কষতে বালক রাজেন্দ্রনাথের আপনা থেকেই ভাল লাগতো এবং যত দিন যেতে লাগল, গুরুমশাই তত কঠিনতর মানসাঙ্ক দিতে লাগলেন কিন্তু রাজেন্দ্রনাথের মন তাতে বিমুখ হতো না। এই-ভাবে বালক রাজেন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ স্যার রাজেনের জন্য তাঁর সর্ব্বপ্রধান মানসিক ঐশ্বর্য্য—অসাধারণ স্মরণ এবং ধীশক্তি—সংগ্রহ করছিল।

এই ভাবলা গ্রামে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৮২ বছর আগে, এক অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-বংশে রাজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বারাসাতে মোক্তারী করতেন এবং সে-সময় উকীল হিসাবে তিনি সে অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

ভগবানচন্দ্রের চারবার বিবাহ হয়। সেকালের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, পুত্র না হলে লোকে পুন্নাম বলে এক নরক আছে, সেই নরকে যায়, পিতৃ-লোক পিণ্ড পায় না, ইত্যাদি……অর্থাৎ পুত্র না হওয়া শুধু অমঙ্গলের কথা নয়, মহাপাপের কথা! সেইজন্য লোকে, পুত্র না হলে, এই সংস্কারবশত দু' তিন' চারবার বিবাহ করতেন। ভগবানচন্দ্রের প্রথম স্ত্রীর কোন পুত্র না হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন; দ্বিতীয় স্ত্রার কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি তৃতীয়বার বিবাহ করলেন; কিন্তু তৃতীয় স্ত্রীরও কোন সন্তান হলো না। তখন তিনি চতুর্থবার বিবাহ করেন। এই চতুর্থ স্ত্রীর এক কন্যা হয়। কন্যা জন্মগ্রহণ করার ঠিক এক বছর পরে, তাঁর তৃতীয় স্ত্রীর একটি পুত্র-সন্তান হ'লো। সেই পুত্রই হলেন পিতার পরম আকাঙ্ক্ষার ধন, তাঁর প্রথম এবং একমাত্র সন্তান, আমাদের রাজেন্দ্রনাথ।

দুই

রাজেন্দ্রনাথের যখন মাত্র ছ' বছর বয়স, সেই সময় অকস্মাৎ ভগবানচন্দ্র পরলোক গমন করলেন। একান্নবর্তী সংসারের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথের মা'র অংশে মাত্র গুটিকতক টাকা এবং খানকতক বাসন পড়লো।

গ্রামের অন্য সব ছেলেদের মত, রাজেন্দ্রনাথ গুরুমশাই-এর পাঠশালায় ভর্ত্তি হলেন—যে-পাঠশালার কথা আমরা গোড়াতেই বলেছি। যে-সময়ের কথা আমরা বলছি সে-সময় ইংরেজী লেখা-পড়া-জানা লোক ভাবলা গ্রামে একটিও ছিলনা। রাজেন্দ্রনাথের বংশে তাঁর জ্যাঠতুতো ভাই চন্দ্রকুমার প্রথম ইংরেজী লেখা-পড়া শেখেন। সেই সময় বসিরহাট থেকে কিছুদূরে কালীগঞ্জে ছিল সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস। সেই অফিসে চন্দ্রকুমারের কেরাণীর একটা চাকরী হলো। ভগবানচন্দ্রের মৃত্যুর পর, সংসারে খাওয়া-পরার দৈন্য না থাকলেও টাকার অভাব বিশেষভাবে হতে লাগলো। চন্দ্রকুমারকে কালীগঞ্জে পাঠাবার আর একটা কারণ ছিল। কালীগঞ্জে মুখুজ্যে পরিবারের অনেক ধেনো জমি ছিল—সেই জমির উৎপন্নে তাঁদের সারা বছরের চালের জোগান হতো। নীলকুমার চাটুজ্জে বলে তাঁদের একজন আত্মীয় ছিলেন। কালীগঞ্জে তাঁর বাড়ী ছিল। তিনিই মুখুজ্জেদের হয়ে সেই সব জমির তদারক করতেন। চন্দ্রকুমার তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। নীলকুমার বাড়ুজ্জে বাড়ীতে একজন মাষ্টার রেখে, তাঁর বাড়ীর ছেলেদের ইংরেজী শেখাবার ব্যবস্থা

করেছিলেন। ন' বছর বয়সে রাজেন্দ্রনাথকেও নীলকুমার চাটুজ্জের সেই বাড়ীর স্কুলে ইংরেজী লেখাপড়া শেখাবার জন্যে পাঠান হলো। রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে এলো তাঁর ভাইপো অর্থাৎ তাঁর জ্যাঠতুতো ভাইএর ছেলে মতিলাল। রাজেন্দ্রনাথ মতিলালের চেয়ে মাত্র এক বছরের বড় ছিলেন।

খুব উৎসাহ নিয়ে তাঁরা ইংরেজী লেখাপড়া শিখতে কালীগঞ্জে এলেন কিন্তু ভগবান বাদ সাধলেন। সেই সময় সে অঞ্চলে ভয়ানক বসন্ত দেখা দিল। রাজেন্দ্রনাথ এবং মতিলাল তাঁরা দুজনেই সেই ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হলেন। মতিলাল কিছুদিনের মধ্যে সেরে উঠলেন কিন্তু সেই কঠিন ব্যাধিতে রাজেন্দ্রনাথের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠলো। এমন অবস্থা হয়েছিল যে আত্মীয়-স্বজনেরা জীবনের আশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বহু কষ্টে দেবতার আশীর্ব্বাদে এবং জননীর আকুল সেবায় রাজেন্দ্রনাথ সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু তাঁর শরীর এমনভাবে ভেঙ্গে গেল যে পড়াশোনা কিছুকালের মত বন্ধ রাখতে হলো।

ভাবলায় জননীর স্নেহাঞ্চলের ছায়ায় সাধারণ গ্রাম্যছেলের অলস জীবন যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু তারই মধ্যে তিনি অলস ছিলেন না। দুটি জিনিষ এই সময় প্রবলভাবে তাঁর মনকে টানে, একটি হল, সাঁতার কাটা, আর একটি হ'ল মাছধরা। এই দুই খেলায় তাঁর মন মেতে উঠল। সাঁতার কাটায় তিনি গ্রামের ছেলেদের মধ্যে ওস্তাদ হয়ে উঠলেন এবং মাছধরা সম্পর্কে তাঁর সেই অল্প বয়সে এতদূর অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল যে গ্রামের আশে পাশে সমস্ত পুকুরের

কোথায় কি মাছ আছে, তা পর্য্যন্ত তাঁর নখ-দর্পণে ছিল। সেই থেকে খেলা-ধূলার প্রতি উৎসাহের অভাব তাঁর কোন দিন হয় নি। তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে, বাঙালী ছেলেমেয়েদের খেলা-ধূলা এবং শরীর-চর্চ্চার ব্যাপারে—তিনি ছিলেন আমাদের সকলের চেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। পর্ব্বত-প্রমাণ কাজের বোঝার মধ্যে থেকেও তিনি বাঙালী ছেলে-মেয়েদের খেলা-ধূলার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য কখনও করেন নি।

কিন্তু সকল খেলা-ধূলার মধ্যে থেকে বালকের মনে একটী জিনিস প্রায়ই মাথা নাড়া দিয়ে উঠতো—সে হলো ইংরেজী লেখাপড়া শেখবার বাসনা। সেই যে নীলকুমার চাটুজ্জের বাড়ীতে কয়েকদিন ইংরেজী পড়া-শোনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তার সম্ভাবনার কথা বালকের মনে নানা রকমের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতো। বালকের মনে প্রবল বাসনা হলো যে, ইংরেজী লেখা-পড়া শিখতেই হবে। সেই কথা প্রায়ই বালক বিধবা জননীকে জানাতেন। ছেলের কথা শুনে শুনে, ছেলের আকাঙ্ক্ষার স্পর্শ লেগে, সেই গ্রাম্য নারীর মনেও তীব্র বাসনা জাগলো, ছেলেকে ইংরেজী লেখা-পড়া শেখাতেই হবে! কিন্তু হিন্দুঘরের দরিদ্র বিধবা রমণী তিনি! কি করে ছেলের ইংরেজী লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করবেন?

প্রত্যেক মা-ই তাঁর নিজের ছেলেকে ভালবাসেন। কিন্তু অনেক সময় মাতৃ-স্নেহ অন্ধ হয়ে স্নেহের আগ্রহে ছেলের কল্যাণ করতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে ছেলের অকল্যাণই করে ফেলে। রাজেন্দ্রনাথ ছ লেন তাঁর জননীর জীবনের একমাত্র সম্বল। নিজের প্রাণের চেয়ে

তিনি ছেলেকে ভালবাসতেন কিন্তু তিনি ছিলেন বীর রমণী। ছেলের প্রতি তাঁর নিজের স্নেহের চেয়ে, তাঁর কাছে ঢের বড় জিনিস ছিল —ছেলের কল্যাণ।

তিনি বুঝলেন যে রাজেন্দ্রনাথকে ইংরেজী লেখা-পড়া শেখাতে হবে। কিন্তু তাঁর স্নেহাঞ্চলে বেঁধে রাখলে তার কোনও সম্ভাবনা কোথাও নেই! তিনি মনে মনে উপায় খুঁজতে লাগলেন। সেই সময় বারাসাতে জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় বলে একজন লোক ছিলেন। ভগবানচন্দ্র জয়গোপালকে লেখা-পড়া শেখান, চাকরী জুটিয়ে দেন, এমন কি একখানি ছোট বাড়ীও করিয়ে দিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের জননী ঠিক করলেন যে, তিনি জয়গোপালের দ্বারস্থ হবেন। হিন্দুঘরের দরিদ্র বিধবা তিনি—এ সব ব্যাপারে সঙ্কোচ, লজ্জা হওয়াই তাঁর স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর কাছে তাঁর নিজের সঙ্কোচ বা লজ্জা-বোধের চেয়ে ঢের বড় জিনিস ছিল, তাঁর ছেলের কল্যাণ। রাজেন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি বারাসাতে এসে জয়গোপালের দ্বারস্থ হলেন। বল্লেন, একদিন তাঁর স্বামীর কাছ থেকে যে উপকার তিনি পেয়েছেন, তা স্মরণ করে, তাঁর ছেলের লেখা-পড়ার ভার তাঁকেই নিতে হবে! জয়গোপাল আনন্দিতচিত্তে রাজী হলেন। রাজেন্দ্রনাথ বসিরহাটেই থেকে গেলেন।

বসিরহাটে থেকে রাজেন্দ্রনাথ আর মতিলাল একসঙ্গে পড়তে লাগলেন।

তিন

বসন্ত-রোগের আক্রমণের পর থেকে তার শরীর একদম ভেঙ্গে পড়ে। প্রায়ই কোন না কোন রোগে তাকে শয্যাশায়ী হতে হতো। ক্রমশঃ ছেলের স্বাস্থ্য এবং জীবন সম্বন্ধে বিধবা জননী একান্ত চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন। একজন প্রবীণ কবিরাজকে দেখান হলো। রাজেন্দ্রনাথকে দেখে তিনি রাজেন্দ্রনাথের জননীকে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিলেন যে, ছেলেকে কোথাও বায়ু পরিবর্তনে না পাঠালে সেরে ওঠা দুঃসাধ্য হবে। কিন্তু কোথায় পাঠাবেন?

বহু চিন্তার পর তাঁর মনে পড়লো, সুদূর আগ্রাতে তার এক ভাই আছেন। সেখানে যদি রাজেন্দ্রনাথকে রাখা যায়, তাহলে হয়ত তার স্বাস্থ্য এবং পড়াশোনার সুবিধা হতে পারে। আগ্রাতে সেই সময় তাঁর ভাই পণ্ডিত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য থাকতেন। তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং অত্যন্ত সদাশয় লোক ছিলেন। আগ্রাতে তিনি একটি কালী বাড়ী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই কালী বাড়ী সে-অঞ্চলের সাধু-সজ্জনের কাছে সেই সময় রীতিমত পরিচিত ছিল।

রাজেন্দ্রনাথের জননী তাঁর পুত্রের ব্যবস্থা-সম্বন্ধে সমস্ত কথা জানিয়ে পণ্ডিত দ্বারকানাথকে পত্র লিখলেন। ভগ্নীর সেই পত্র পেয়ে দ্বারকানাথ রাজেন্দ্রনাথকে তাঁর কাছে রেখে লেখা-পড়া শেখাতে সম্মত হলেন।

এখন হলো রাজেন্দ্রনাথের জননীর কঠোর সমস্যা। কেমন করে সেই সুদূর আগ্রাতে তিনি সেই শিশুকে একা পাঠাবেন?

রাজেন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র বারো কি তেরো বছর হবে। ভাবলা, কালীগঞ্জ আর বারাসাতের বাইরে কোন জগত বালক তখনও দেখে নি। তার ওপর রুগ্ন, অর্থহীন! আজ আমরা সহরে বসে আগ্রা যাওয়াকে যে-ভাবে দেখি, পঞ্চাশ বছর আগে সুদূর ভাবলা গ্রাম থেকে আগ্রার দিকে চাইতে হলে দূরত্বটা যে কত বেশী এবং রহস্যজনক মনে হতো তা আজ আমরা বুঝতে পারবো না। কিন্তু রাজেন্দ্রনাথের জননী বিচলিত হলেন না। তখন তাঁর সামনে একমাত্র চিন্তা, তাঁর পুত্রের কল্যাণ! পুত্রের ভবিষ্যত কল্যাণের জন্যে তখন একমাত্র ব্যবস্থা হচ্ছে, তাকে আগ্রাতে পাঠানো! যেমন করেই হ'ক, তা করতে হবে! তাতে যদি জননীর বুক ভেঙ্গে যায়, পুত্রের কল্যাণে তা একদিন সার্থক হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে বারাসাতের জয়গোপাল মুখুজ্জেও মারা গিয়েছিলেন। সেইজন্যে বারাসাতেও রাজেন্দ্রনাথের থাকবার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

একদিন সঙ্গে একটি চাকরকে দিয়ে তিনি বালক পুত্রকে বিদায় দিলেন। পুত্রকে বিদায় দেবার সময় তাঁর চোখে এক ফোঁটাও অশ্রু ছিল না। যদি তাঁর অশ্রুতে ছেলে শঙ্কিত ভীত হয়! এ বিদায় দেওয়া আজকাল আমরা ঠিক বুঝতে পারবো না। সেদিন পথ-ঘাট এত নিরাপদও ছিল না এবং যাতায়াতও এত সুবিধাজনক ছিল না।

ভাবলা গ্রাম থেকে বালক রাজেন্দ্রনাথ গ্রামের একটী লোককে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। ছাব্বিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে তাঁরা বারাসাতে এলেন। সেখান থেকে আরো আট মাইল পায়ে

হেঁটে তাঁরা নবাবগঞ্জে (ব্যারকপুর) এলেন। নবাবগঞ্জে তাঁর এক মামা থাকতেন। এই চৌত্রিশ মাইল পায়ে হেঁটে আসতে তাঁদের তিনদিন এবং তিনরাত লেগেছিল এবং একরাত তাঁদের রাস্তার উপর শুয়েই কাটাতে হয়েছিল। এইভাবে বারো বছরের ছেলে এসে পৌঁছল নবাবগঞ্জে। নবাবগঞ্জে ছিলেন, তাঁর মামা যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী। যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী ছিলেন রাজেন্দ্রনাথের বিমাতার ভাই। রাজেন্দ্রনাথকে তাঁর দ্বারে সেইভাবে উপস্থিত দেখে, তিনি পরম স্নেহে বালককে বুকে টেনে নিলেন। সেই স্নেহের মধ্যে বালক পথের সমস্ত ক্লেশ ভুলে গেলেন। রাজেন্দ্রনাথ কয়েকদিন সেখানে রইলেন। জীবনে তিনি যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলীর সেই স্নেহ ভোলেন নি। তাই পরবর্তী জীবনে যখন তিনি সমর্থ হলেন, তিনি সেদিনকার কথা স্মরণ করে, যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলীর পরিবারে নিয়মিত অর্থ-সাহায্য করতেন।

রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে শীত-বস্ত্র কিছুই ছিল না বল্লেই হয়। যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী বালকের সঙ্গে কিছু শীত-বস্ত্র দিয়ে দিলেন। গঙ্গা পার হয়ে তাঁরা বৈদ্যবাটীতে এলেন। বৈদ্যবাটী থেকে বালককে আগ্রা-যাত্রী ট্রেণের একটা থার্ড-ক্লাশ কামরায় তুলে দেওয়া হলো। সেই টিকিটখানি এবং মাত্র তিনটা টাকা, তাঁর পাথেয়। ট্রেণ আগ্রার দিকে যাত্রা করলো। সঙ্গের চাকর ভাবলায় ফিরে এলো।

চার

তিন বছর তিনি আগ্রাতে ছিলেন, এক আধ সপ্তাহ নয়। সেখান থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময়

হঠাৎ জরুরী চিঠি এলো যে, তাঁর মা অত্যন্ত অসুস্থ। রাজেন্দ্রনাথকে সব ফেলে কালবিলম্ব না করে চলে আসতে হবে।

এ-হেন অবস্থায় আর দ্বিতীয় পথ থাকে না। কালবিলম্ব না করে, সব ছেড়ে দিয়ে রাজেন্দ্রনাথ আবার ভাবলা গ্রামে শঙ্কিত-হৃদয়ে প্রবেশ করলেন।

বাড়ীতে ঢুকে দেখেন, জননী দিব্য সুস্থ অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবে এ-চিঠির অর্থ কি? সংসারের সকলের দাবী যে তাঁকে বিয়ে করতে হবে। বিয়ের কথা শুনলে, রাজেন্দ্রনাথ আগ্রা থেকে আসতেন না—এটা তাঁর আত্মীয়েরা জানতেন। তাই বালকের সঙ্গে তাঁরা এই চাতুরী করেছিলেন। একান্নবর্ত্তী প্রাচীন পরিবারের প্রভুত্ব, না মেনে উপায় নেই। বালক রাজেন্দ্রনাথ যতদূর সম্ভব প্রতিবাদ জানালেন কিন্তু কোনই ফল হলো না। বিয়ে তাঁকে করতেই হলো। তখন তাঁর বয়স প্রায় সতেরো বছর। তখনও প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন নি।

পাঁচ

বিয়ে হয়ে গেলে রাজেন্দ্রনাথ কলকাতায় পড়তে এলেন। রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতিলালও কলকাতায় এলেন।

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর স্কুল থেকে তাঁরা দুজনেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। মতিলাল ডাক্তারী পড়বার জন্যে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হলেন, রাজেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হলেন।

রাজেন মুখোপাধ্যায়, লেস্‌লী সাহেবের কাছে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের কথা তুল্লেন।
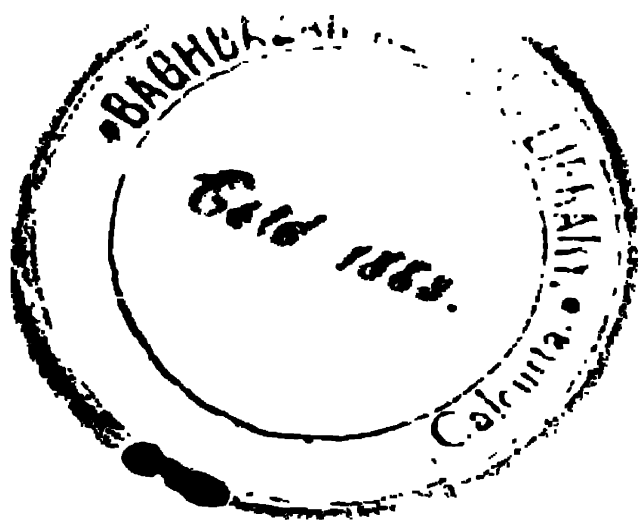
রাজেন্দ্রনাথ এঞ্জিনীয়ারিং শেখবার জন্যে প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ একটা এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ খোলে। অবশ্য তাতে যে এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা পূরা-মাত্রায় দেবার ব্যবস্থা ছিল তা নয়। সাধারণত পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টে যে-সব ওভারশিয়ারের দরকার হতো, সেই সব পদের উপযুক্ত এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা সেখানে দেওয়া হতো। রাজেন্দ্রনাথ প্রায় তিন বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েন। হঠাৎ সেই সময় তাঁর শরীর ভীষণভাবে আবার ভেঙ্গে পড়ে। প্রায়ই তাঁর জ্বর হতো। তার ওপর ছিল, ক্রমবর্দ্ধমান অর্থাভাব। কোন উপার্জ্জনের ক্ষমতা যখন ছিল না, তখন তাঁর উপর বিবাহের দায়িত্ব চাপান হয়; সেদিক দিয়েও মনে মনে অর্থের অভাবে তিনি অত্যন্ত অস্বোয়াস্তি ভোগ করতেন। এই সমস্ত নানাকারণে ডিপ্লোমা নেবার আগেই তাঁকে কলেজের পড়া ছেড়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় মন দিতে হলো।

দুই

সেই দুরবস্থার মধ্যেও তাঁর অন্তরের তীব্রতম বাসনা ছিল, তিনি সাধারণ বাঙালী ছেলের মত কেরাণীগিরি করে, অথবা আজীবন চাকরীর দাসত্ব বয়ে বেড়িয়ে জীবন নষ্ট করবেন না। এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার প্রতি তাঁর অন্তরের একটা প্রবল প্রীতি স্বভাবতই ছিল। কলেজের পড়া ছাড়লেও, অবসর কালে তিনি এঞ্জিনীয়ারিং বিষয় অনুশীলন করতে লাগলেন। সেই বিষয়ের প্রতি তাঁর একটা তীব্র পিপাসা ছিল। কর্ম্মহান উদাসীন দিনে পথে ঘুরতে ঘুরতে বড় বড়

বাড়ীগুলোর দিকে চেয়ে তাঁর যা আনন্দ হতো, সে রকম আনন্দ তিনি আর অন্য কিছুতে পেতেন না। এই মহানগরীর পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে, কল্পনায় তিনি শূন্য যায়গায় অপরূপ সব অট্টালিকা গড়ে তুলতেন। সেই ছিল তাঁর অবসর-বিনোদন, সেই ছিল তাঁর অবসরের চিন্তা, অন্তরের বিলাস, যৌবনের খেলা।

যে-সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি, সে-সময় বাঙালী ছেলেদের মধ্যে স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্পনা করা একটা সুদূরপরাহত ব্যাপার ছিল। কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ স্বাধীন আত্মবিকাশের সেই মনোবৃত্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন—তাই জীবনের প্রথম অবস্থায়, যখন তাঁর টাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, চাকরী গ্রহণ করতে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। যখনই যেখানে নতুন বড় বাড়ী হতো, তিনি সেখানে যেতেন। সেই যায়গায় ঘুরতেন ফিরতেন; দেখতেন, কেমন করে সেই সব তৈরী হচ্ছে।

সেই সময় রাজেন্দ্রনাথ যে মেসে বাস করছিলেন, সেই মেসে রামব্রহ্ম সান্যাল বলে এক ভদ্রলোক থাকতেন। তিনি সেই মেসে থাকতে থাকতেই আলীপুর পশু-শালার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হলেন। এক মেসে বহুদিন একসঙ্গে থাকার দরুণ সান্যালের সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। সান্যাল যখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে আলীপুর পশু-শালায় গেলেন, তখন রাজেন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আলীপুরে যেতেন।

একদিন তাঁরা দুই বন্ধুতে বাগানের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় রাজেন্দ্রনাথ দেখেন যে এক যায়গায় একটা

সাঁকো তৈরী হচ্ছে, আর সেখানে কতকগুলো দেশী মিস্ত্রীকে নিয়ে একজন ইংরেজ বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েছেন। ইংরেজটী হিন্দুস্থানী বা বাংলা ভাল জানতেন না। তিনি যা বোঝাতে চাইছেন, দেশী মিস্ত্রীরা তা বুঝতে পারছে না। এই নিয়ে সেখানে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। হঠাৎ কি মনে করে রাজেন্দ্রনাথ সেই সাহেবের হয়ে মিস্ত্রীদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন, কি করে সেই কাজটা করতে হবে। মিস্ত্রীরা ব্যাপারটা বুঝে অবিলম্বে কাজে হাত দিল।

সেই ইংরেজটী হলেন ব্রাডফোর্ড লেস্‌লী—সেই সময়কার কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান এঞ্জিনীয়ার। পরে ইনিই আমাদের বর্ত্তমান হাওড়া পোলের ডিজাইন নির্ম্মাণ করেন এবং নাইট উপাধিতে ভূষিত হন।

রাজেন্দ্রনাথের সেই অযাচিত সহজ ব্যবহার দেখে ইংরেজটী প্রীত হন এবং কৌতূহলী হয়ে রাজেন্দ্রনাথকে তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তখন রাজেন্দ্রনাথ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেন এবং কথা-প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের কথা বলেন। স্যার ব্রার্ডফোর্ড মন দিয়ে যুবকের সমস্ত কথা শুনলেন। বিদায়ের সময় সাহেব তাঁর কার্ডখানি রাজেন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে বল্লেন, তিনি যদি কালই সকালবেলা পলতা জল-কলের কারখানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তা হলে ভাল হয়।

সাত

তার পরের দিন সকালবেলা। কে জানে কি হবে? রাজেন্দ্র-নাথের মন আশা-আকাঙ্ক্ষায় দুলে উঠলো। কিন্তু বিপদ্ হলো পোষাক নিয়ে। কাপড় পরে দেখা করার চেয়ে সাহেবী পোষাকেই দেখা করা ভাল! কাপড় ছেড়ে রাজেন্দ্রনাথ একটা শাদা প্যাণ্ট আর তার উপর শাদা কোট পরে, ফিটফাট হয়ে পলতা জলের কলের দিকে যাত্রা করলেন।

ব্রার্ডফোর্ড লেস্‌লী রাজেন্দ্রনাথের সেই ফিটফাট ভঙ্গী দেখে সন্তুষ্ট হলেন। তখন সেখানে জল-কলের ব্যবস্থাকে আরও বাড়ানো হচ্ছিল; নতুন নতুন চৌবাচ্চা তৈরী এবং সেই সম্পর্কিত অন্য সব কাজ হচ্ছিল। লেস্‌লী সাহেব রাজেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে সেই দিকে বেড়াতে বেরুলেন। বেড়াতে বেড়াতে তিনি রাজেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করতে লাগলেন; রাজেন্দ্রনাথ আত্ম-বিশ্বাসী অভিজ্ঞ কনট্রাক্‌টারের মত তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

লেস্‌লী সাহেব বুঝলেন যে-দায়িত্ব দেবার জন্যে তিনি সেই যুবককে ডেকেছেন, যুবক সত্যই তার উপযুক্ত! এই ভাবে প্রশ্ন করতে করতে হঠাৎ লেস্‌লী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, এই যে সব কাজ আরম্ভ করা হয়েছে, যা নির্দ্ধারিত রেট, সেই রেটে এর দায়িত্ব তুমি নিতে পার? আমি জানতে চাই, হাঁ কি না?

কি "রেটে" সেই কাজ নির্দ্ধারিত হয়েছে তা তাঁর জানা নেই অথচ তক্ষুণি হাঁ কি না বলতে হবে! রাজেন্দ্রনাথ ভাবলেন, যে-কাজ

যখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, তখন যে-রেটে আর একজন করতে পারছে, তিনিই বা পারবেন না কেন? এতদিন ধরে যে-সুযোগের অপেক্ষায় তিনি বসেছিলেন, আজ জীবনে সেই সুযোগ এসেছে! একে কখনই ছেড়ে দেওয়া যায় না।

এই ভেবে রাজেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, হাঁ, আমি সেই রেটে কাজ নিতে পারি, কিন্তু আমি যেমন না জেনে সেই দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনাকেও আমাকে তার জন্যে সমস্ত কাজেরই কণ্ট্রাক্ট দিতে হবে!

ব্রাডফোর্ড লেস্‌লী সম্মত হলেন। রাজেন্দ্রনাথের জীবনের আর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

এই ঘটনার পঞ্চাশ বছর পরে কাল-চক্রে আর এক ঘটনা ঘটে। ব্রাডফোর্ড লেস্‌লীর বয়স তখন নব্বুই। তিনি তখন স্যার ব্রাডফোর্ড লেস্‌লী—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এঞ্জিনীয়ার জগৎ-খ্যাত হাওড়া-পোলের পরিকল্পনাকারী। তখন ১৯২২ সাল। স্যার লেস্‌লীর হাওড়া পোল ভেঙ্গে নতুন ধরণের আর একটি পোল তৈরী করতে হবে। ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ এঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে এক কমিটী গঠিত হয়েছে—সেই কমিটীর চেয়ারম্যান স্যার রাজেন্দ্রনাথ। এই কমিটী থেকেই নির্দ্ধারিত হবে, স্যার লেস্‌লীর পুরাণো পরিকল্পনাই থাকবে, না নতুন ধরণের পরিকল্পনা অনুযায়ী পোল তৈরী হবে? ইংলণ্ডে এই কমিটীর অধিবেশন চলছে। স্যার লেস্‌লী তখন বৃদ্ধ, কিন্তু উদ্যমের অন্ত নেই। তাঁর অন্তরের প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে তাঁর পরিকল্পনাকে যেন বিলুপ্ত না করা হয়—কার না সাধ নিজের হাতে

গড়া কীর্ত্তির সঙ্গে অবিনশ্বর হয়ে বেঁচে থাকতে? স্যার লেস্‌লীর মনে বড় ভরসা যে যখন স্যার রাজেন্দ্রনাথ সেই কমিটীর চেয়ারম্যান, তখন তিনি তাঁর অন্তরের এই দাবীকে বুঝবেন।

নব্বুই বছরের বুড়ো লণ্ডনে স্যার রাজেন্দ্রনাথের অফিসে ঢুকছেন—পঞ্চাশ বছর আগে যাকে একদিন তিনিই পথ থেকে ডেকে এনে এই পথে প্রথম নামিয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান ঘোষণা করলো যে স্যার লেস্‌লীর পরিকল্পনা তাঁরই মত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে; কমিটীর প্রত্যেকেই বললেন, নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নততর পরিকল্পনারই আশ্রয় নিতে হবে! স্যার রাজেন্দ্রনাথও বুঝলেন তাই ঠিক! যেখানে বিজ্ঞানের কথা, সেখানে বিজ্ঞানের দাবীকেই তিনি প্রথম স্থান দিয়েছেন। তাঁর জীবনের প্রথম পথ-প্রদর্শকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর চির-কৃতজ্ঞ অন্তর ভেঙ্গে পড়লেও বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কাছে এঞ্জিনীয়ার হিসাবে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতেই হলো! যেখানে কর্ম্মকুশলতার প্রয়োজন, সেখানে রাজেন্দ্রনাথ বীর সেনাপতির মত, অবিচলিত চিত্তে, বৈজ্ঞানিক ফলাফলকেই একমাত্র কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারক বলে গ্রহণ করতেন, সেখানে কোনও হৃদয়-আবেগের স্থান ছিল না। তাই তিনি এত বড় হতে পেরেছিলেন।

লর্ড লিস্টার
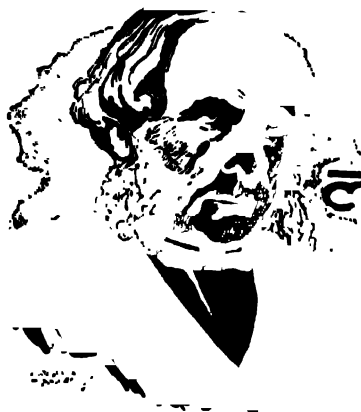
এক

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগেকার কথা। হলাণ্ডের ডেল্‌ফ্‌ট্‌ শহরের গির্জ্জের দরজায় বসে একজন বুড়ো আপনার মনে দিনরাত শুধু কাঁচ ঘস্‌তো। বুড়ো ছিল সেই গির্জ্জের চৌকিদার। সারাদিন আপনার মনে একলা বসে থাকতে থাকতে, তার মনে খেয়াল হয়েছিল, কি করে কাঁচ ঘসে এমন তৈরী করা যায়, যা দিয়ে খুব ছোট জিনিসও বড় করে দেখা যাবে। বুড়োর নাম ছিল, লিউয়েনহুক।

তখন কেই-ই বা তাকে জানতো? গির্জ্জের একজন সামান্য চৌকিদার, তার খেয়ালের কথা কেই বা ভাবে?

কিন্তু সেই বুড়ো কাঁচ ঘসতে ঘসতে হঠাৎ একদিন একটা নতুন রকমের যন্ত্র তৈরী করে ফেল্লো। তার ভেতর দিয়ে অতি ছোট

জিনিসও খুব বড় করে দেখা যায়। সেই হলো জগতের প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

বুড়োর আনন্দ আর দেখে কে? সারাদিন আপনার খেয়ালে, এটা ওটা সেটা নিয়ে যন্ত্রে দেখে। ছোট ছোট সব জিনিস, যা এমনি চোখে ভাল করে দেখা যায় না—মাছির মাথা, প্রজাপতির ডানা, মৌমাছির হুল, ফড়িংএর পা! যত দেখে, বুড়ো ততই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। সেই সব ছোট, অতি ছোট জিনিসের মধ্যে, রেখার পর রেখা, স্তরের পর স্তর কি অপূর্ব্ব গঠন-কৌশল!

হঠাৎ একদিন বুড়োর কি খেয়াল গেলো, এক ফোঁটা বৃষ্টির জল নিয়ে দেখতে।

যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখতে গিয়েই বুড়ো চমকে উঠলো! এ কি ব্যাপার!

বুড়ো আবার ভাল করে দেখলো! এ কি বিস্ময়! সেই এক ফোঁটা জলে হাজার হাজার প্রাণী তীব্র বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কারা এরা? কোথা থেকে এলো সেই এক ফোঁটা জলে? দৃষ্টির অগোচর এত ছোট জীবন্ত প্রাণী আছে, তাই বা কে জানতো?

সেদিন সেই ডেল্‌ফ্‌ট্‌ শহরে বুড়োর চোখে এতদিনের অদেখা এক বিরাট পৃথিবী প্রথম ধরা পড়লো।

দৃষ্টির অগোচর সেই ছোট ছোট প্রাণীদেরই আজ আমরা বলি,

সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে তারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, আমাদের নিঃশ্বাসের বাতাসে, আমাদের জলের গেলাসে, আমাদের

খাবারের পাত্রে, আমাদের শোবার বিছানায়। অথচ বুড়ো লিউয়েনহুকের যন্ত্র তৈরী হবার আগে পর্য্যন্ত কেউই তাদের কোন খবর জানতো না।

কলম্বাস একটুকরো পৃথিবী খুঁজে বার করেছিলেন। লিউয়েনহুক একটা সম্পূর্ণ নতুন জগৎ খুঁজে বার করলেন।

দুই

বুড়ো লিউয়েনহুক নব্বুই বছর পর্য্যন্ত বেঁচেছিলেন! যতদিন বেঁচেছিলেন তাঁর যন্ত্রটা কাউকে ব্যবহার করতে দিতেন না। সেই সব নতুন জীবদের দেখবার যাঁর আগ্রহ হতো, তাঁকে লিউয়েনহুকের ল্যাবরেটরীতে আসতে হতো। ইংলণ্ডের রাণী এসেছিলেন, রুশিয়ার পিটার দি গ্রেট এসেছিলেন, সেই ডেল্ফ্‌ট্ শহরে গির্জ্জের চৌকিদারের ঘরে!

এত বড় একটা আবিষ্কার, কিন্তু জগতে কোথাও কোন হৈ চৈ হলো না। দৃষ্টি-অগোচর জীবাণুরা আছে, থাকুক দৃষ্টির অগোচরে তারা। কি হবে তাদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে?

তখন বৈজ্ঞানিক ব্যস্ত, বাষ্প আর বিদ্যুৎ নিয়ে।

আর তখন কেই-ই বা জানতো, সেই নগণ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবগুলির মহিমা। তখন কে জানতো, তাঁরা আছেন বলে, পৃথিবীতে ব্যাধি আছে; তাঁরা আছেন বলে, গাছ মাটী থেকে সার পায়! তখন কে জানতো, মানুষের এত বড় শত্রু, আবার মানুষের এত বড় বন্ধু, ত্রিভুবনে আর নেই? মড়কের পর মড়কে, শহরের পর শহর জনশূন্য

হয়ে গিয়েছে, মানুষ ব্যাকুল হয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে ভেবেছে, ভগবানের অভিশাপ, নয়, অপ-দেবতার উৎপাত। কিন্তু ভগবানের অভিশাপ হোক, আর অপদেবতার উৎপাতই হোক, সে যে এসেছে সেই দৃষ্টির অগোচর জীবাণুদের আশ্রয় করে তার খবর কেই-ই বা জানতো ?

তাই সেদিন কেউ আর তাদের সম্বন্ধে মাথা ঘামায় নি।

তিন

যে বছর লিউয়েনহুক মারা যান, তার দু'বছর পরে ইতালীতে স্পালান্‌জানি বলে একজন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেই সব দৃষ্টির অগোচর প্রাণীদের নিয়ে ভাবতে লাগলেন।

একটা জিনিস নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে, একটা মরা ইঁদুর, কি একটা ফল কিছুদিন পড়ে থাকলেই দেখা যায় যে, সেখানে কোথা থেকে নানা রকমের পোকা গজিয়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে সেই সব পোকা এলো ?

আগে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, সেই পচা জিনিস থেকেই পোকা মাকড়ের জন্ম হয়েছে। সেই সময় লোকে বিশ্বাস করতো যে, সেই রকম পচা জিনিস থেকে, অথবা যেখানে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই, সেখানে আপনা থেকেই প্রাণীর জন্ম হতে পারে। অর্থাৎ নির্জ্জীব পদার্থ থেকে সজীব প্রাণী জন্মাতে পারে।

স্পালান্‌জানি এসে প্রমাণ করে দেখালেন যে, তা কখনই হতে পারে না। যেখানে প্রাণ নেই, সেখানে প্রাণীর জন্ম হতে পারে না।

লর্ড লিষ্টার রাতের পর রাত হাসপাতালে জেগে কাটাচ্ছিলেন।

যেখানে প্রাণীর জন্ম হয়, সেখানে বুঝতে হবে, কোন না কোন রকমে, সেখানে আগে প্রাণ-ওয়ালা কিছু ছিল। এই যে "প্রাণ-ওয়ালা কিছু," যাদের চোখে দেখা যায় না বলে মনে হয় যে নেই, তাদেরই নাম হলো জীবাণু।

কেমন করে এই সব জীবাণু বাঁচে, কি-ই বা তাদের চরিত্র, তাই নিয়ে স্পালান্‌জানি বহু গবেষণা করলেন। তিনি দেখালেন যে, একটা জীবাণু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কেমন করে লক্ষ লক্ষ জীবাণুতে পরিণত হয়। তারা আপনা থেকে ফেটে ফেটে গিয়ে সংখ্যায় বাড়তে থাকে।

কিন্তু মানুষের জগতের সঙ্গে, মানুষের জীবনের সঙ্গে তাদের যে কি সম্বন্ধ, স্পালান্‌জানি তা আবিষ্কার করতে পারেন নি।

এই ভাবে আরও পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। জীবাণুদের নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিকই মাথা ঘামান না।

পঞ্চাশ বছর পরে ফ্রান্সের এক কলেজের ছাত্রের মনে জীবাণুদের সম্বন্ধে একটা বিশেষ কৌতূহল জেগে ওঠে। ছেলেটির নাম লুই পাস্তুর; তাঁর বিষয় ছিল রসায়ন; কিন্তু অধ্যাপকেরা লক্ষ্য করতেন যে, রসায়নের চেয়ে জীবাণুদের দিকেই যুবকের মনের আকর্ষণ বেশী।

লুই পাস্তুর ছিলেন, কলেজের একজন রীতিমত ভাল ছেলে। কিন্তু অধ্যাপকেরা দেখতেন যে, অবসর পেলেই লুই অণুবীক্ষণ-যন্ত্র আর সেই সব নগণ্য পোকাদের নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। লুইকে সেই ভাবে সময় নষ্ট করতে দেখে, তাঁরা দুঃখিত হতেন। তাঁরা প্রায়ই বলতেন, আচ্ছা লুই, এই ভাবে সময় নষ্ট করা তোমার কি উচিত? ও সব

তুচ্ছ প্রাণীদের নিয়ে রাতদিন খেলায় মত্ত থাকলে, তোমার পড়াশোনার যে ক্ষতি হবে !

সেই সব নগণ্য প্রাণী যে তুচ্ছ নয়, তা জানা গেল আরও কয়েক বছর পরে।

তখন লুই আর কলেজের ছাত্র নন। রাসায়নিক হিসাবে সেই অল্প বয়সেই ফ্রান্সে তাঁর তখন যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে। সেই সময় হঠাৎ দেখা দিল এক বিপত্তি। বড় বড় ব্যবসায়ীরা দেখেন, যে-সব বড় বড় কড়া করে তাঁরা নানারকমের ওষুধ বা সেই রকম দরকারী সব তরল পদার্থ তৈরী করতেন, হঠাৎ কি যে হোলো, মাল-মশলা কড়ায় কিছুক্ষণ থাকার পরই সমস্ত জিনিসটা টক হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে লাগলো। তার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে লাগলো। কেন, বা কি করে যে সেই সব জিনিস টকে যাচ্ছে, কেউ তার কোন হেতু বার করতে পারলেন না। তখন তাঁরা সকলে লুই পাস্ত্যরের শরণাপন্ন হলেন।

লুই পাস্ত্যর শেষে নানা পরীক্ষার পর হঠাৎ দেখ্‌তে পেলেন, সেই কলেজে পড়বার সময় অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়ে যে সব তুচ্ছ প্রাণী নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করতেন, তাদেরই এক দল দৃষ্টির অন্তরালে থেকে এই অঘটন ঘটাচ্ছে। সেই সব অদৃশ্য জীবাণুর গা থেকে এক রকম রস বেরিয়ে সমস্ত জিনিসটাকে টক করে দিচ্ছে। সেই জীবাণুদের নাম দিলেন তিনি, ল্যাক্‌টিক্ এ্যাসিড্ ব্যাক্‌টিরিয়া। 'ব্যাক্‌টিরিয়া' জীবাণুদেরই আর এক নাম।

জীবাণুদের এই আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা শুনে সমস্ত জগৎ বিস্মিত

হয়ে উঠলো। পাস্ত্যর পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ঘরে আমাদের দুধ যে টকে যায়, জিনিস যে পচে যায়, সবই এই জীবাণুদের কাণ্ড।

তখন তাঁর সমস্ত দৃষ্টি জীবাণুদের ওপর গিয়ে পড়লো। তিনি দেখলেন যে, মানুষের পৃথিবীতে যত রকমের মানুষ আছে, জীবাণুদের মধ্যেও সেই রকম নানা রকমের জীবাণু আছে। তাদের গঠন আলাদা, তাদের জীবন আলাদা, তাদের চরিত্র আলাদা এবং তিনিই প্রথম জগতে প্রমাণ করে দেখালেন যে, আমাদের অনেক মারাত্মক ব্যাধির কারণ হচ্ছে, এই সব জীবাণু। সেই সময় জলাতঙ্ক রোগের কোন চিকিৎসা ছিল না ; তিনি সেই রোগের জীবাণু অনুসন্ধান করে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

অন্ধকার ঘরে যেমন সূঁচ হারিয়ে গেলে, হাতড়ে হাতড়ে তাকে খুঁজতে হয়, অথচ পাওয়া যায় না, তেমনি হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ নানারকমের মারাত্মক ব্যাধিতে মৃত্যুর চেয়ে বেশী যন্ত্রণা পেয়েছে —অথচ সেই সব ব্যাধির হাত থেকে কি করে মুক্তি পেতে পারা যায়, তার কোন সঠিক পথও খুঁজে পায়নি। লুই পাস্ত্যরের আবিষ্কার, সেই মৃত্যু-ভরা অন্ধকারে আলো জ্বেলে দিল। মানুষ বুঝতে পারলো, তার ব্যাধির মূল কোথায়! সেই দিন থেকে জগতের দিকে দিকে, জীবাণুদের সন্ধানে বৈজ্ঞানিকেরা বেরুলেন এবং এই গত একশো বছরের সাধনার ফলে, মানুষ বহু জীবাণুর সন্ধান পেয়েছে, কেউ বা মানুষের বন্ধু, কেউ বা মানুষের শত্রু। তারা যখন বন্ধু হয়, তখন তাদের মত বন্ধুও কেউ নেই ; তারা যখন শত্রু হয়, তখন তাদের মত শত্রুও কেউ নেই!

সেই সময় ইংলণ্ডে লিস্টার নামে একজন ডাক্তার রাতের পর রাত হাসপাতালে জেগে কাটাচ্ছিলেন। রোগীদের অসহ্য যন্ত্রণার চীৎকারে তাঁর জীবন থেকে ঘুম চলে গিয়েছিল। যখনই কোন অপারেশন হয়, প্রায়ই তার পরে সেই জায়গা বিষিয়ে উঠে অল্পদিনের মধ্যেই রোগী মারা যায়। আর সেই সঙ্গে কি অসীম যন্ত্রণা! ভয়ে লোকে হাসপাতালে আসতে চাইতো না; কারণ, তখন লোকের এমনি আতঙ্ক হয়ে গিয়েছিল যে, হাসপাতালে এসে অপারেশন করলেই মরতে হবে। মৃত্যু-সংখ্যা এতো বাড়তে লাগলো যে, ক্রমে ডাক্তারদেরও অপারেশন করতে কুণ্ঠিত হতে হতো।

সেই সময় ইংলিশ চ্যানালের ওপাড় থেকে লুই পাস্তুরের কণ্ঠে তিনি শুনতে পেলেন, "আমাদের দৃষ্টির বাইরে, বাতাসে অসংখ্য সব জীবাণু আছে, যারা জিনিসকে পচিয়ে তোলে, দুধকে টকিয়ে তোলে!"

লুই পাস্তুরের সেই সিদ্ধান্তে লিস্টারের মনের অন্ধকার দূর হয়ে গেল। তাঁর মনে স্পষ্ট ধারণা হলো যে, সেই সমস্ত জীবাণুর দ্বারাই মানুষের ক্ষতস্থান দূষিত এবং বিষাক্ত হয়ে ওঠে। চোখের অদৃশ্য থেকে সেই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন অকালে হরণ করে নিচ্ছে।

কিন্তু বাতাস তো সর্ব্বত্রই রয়েছে! আর বাতাসে রয়েছে লক্ষ লক্ষ জীবাণু। কি করে জীবাণুদের সংস্পর্শ থেকে ক্ষতস্থানকে রক্ষা করা যায়? যদি এমন কোন প্রতিষেধক ওষুধ (antiseptic) ব্যবহার করা যায়, যার সংস্পর্শে জীবাণুরা মরে যাবে, তা হলে এর হাত থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়। এই ভাবে লিস্টার প্রথম প্রতিষেধক ব্যবস্থা

হিসেবে, অস্ত্র-চিকিৎসার সময় ক্ষতস্থানে কারবলিক এসিডের ব্যবহার প্রচলন করলেন। তাতে বেশ সুফল পেলেন, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন যে, সেই তীব্র ওষুধ ব্যবহার করার ফলে ক্ষতস্থান শুকোতে খুব দেরী হতো। ক্রমশঃ তিনি প্রতিবেধক ব্যবস্থার নতুন এবং উন্নত বৈজ্ঞানিক সব ব্যবস্থা আবিষ্কার করলেন এবং জগতে অস্ত্র-চিকিৎসার নতুন যুগকে প্রবর্তন করলেন। ক্রমশঃ তিনি বুঝলেন যে, শুধু বাতাসকে পরিশুদ্ধ করা নয়, ক্ষতস্থানের সঙ্গে যা কিছু সংস্পর্শে আসবে, তাকে জীবাণু-শূন্য করে পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং যাতে ক্ষতস্থান বাইরের দূষিত জীবাণুর সংস্পর্শে না আসে, এমন ভাবে পরিষ্কার করে রাখলেই, প্রকৃতি আপনা থেকেই ক্ষতকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলবে।

লর্ড লিস্টার দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, মানুষের দৈহিক বেদনার হাত থেকে তাকে মুক্ত করবার সাধনায় তিনি ডুবে ছিলেন। তাঁর সাধনার ফলে আজ সমগ্র জগৎ অকালমৃত্যু এবং মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করবার উপায় খুঁজে পেয়েছে।

লর্ড লিষ্টার যখন জীবিত ছিলেন, তখন একবার এক রাজকীয় ভোজ-সভায়, আমেরিকার রাষ্ট্র-প্রতিনিধি লর্ড লিস্টারকে অভিবাদন জানিয়ে বলেছিলেন, “হে লর্ড লিষ্টার, কোন জাতির প্রতিনিধি নয়, কোন জাতি বা সম্প্রদায় নয়, চেয়ে দেখ সমগ্র মানবতা নত হয়ে তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে!”
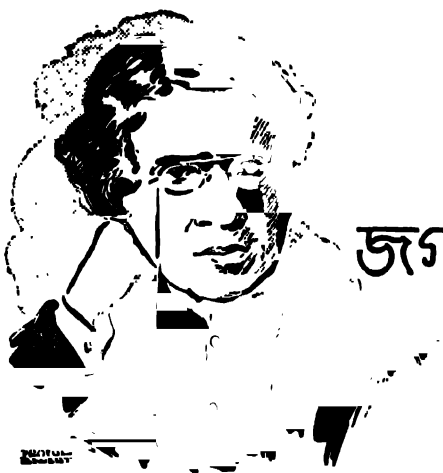
জীবনে যে মহাপুরুষ জড় ও চেতনের বিভেদ দূর করিবার সাধনায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি সহসা আমাদের অসম্পূর্ণ-দৃষ্টিতে চেতন-লোক হইতে জড়লোকে প্রস্থান করিলেন; তাঁহার চেতনাহীন জড়দেহ শত শত ভক্তের বাষ্পাকুল নেত্রের সম্মুখে ভস্মীভূত হইয়া ধূলায় মিশিয়া গেল। অব্যক্তের ঋষি মৃত্যুর পরপারে জড় ও চেতনের বিভেদ সম্পূর্ণরূপে দূর করিলেন কিনা চেতনাবস্থায় তাহা ব্যক্ত করিয়া গেলেন না। অর্দ্ধজড় ও অর্দ্ধচেতন আমাদের শেষ সন্দেহ ঘুচিল না।'

লোক-লোচনের অগোচরে নিভৃতে যে সাধক আপন দেশ-মাতৃকাকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত গবেষণাগারের অন্ধকারে সাধনা করিতেছিলেন, বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কবিতার জয়মাল্য পরাইয়া দেশের লোকের

গোচরে আনয়ন করেন। বৈজ্ঞানিককে সম্বোধন করিয়া কবি সেদিন লিখিয়াছিলেন—

"বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়াছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীন জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।"

ইহার তিন বৎসর পরে তাঁহাকে প্যারিসে দেখা গেল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবরের ডায়েরিতে পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন,—

"এ বৎসর এ পারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিক্‌দেশসমাগত সজ্জনসঙ্গ। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করচেন, আজ এ পারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরী-ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজন-সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জর্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎ-প্রসিদ্ধ

বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস! একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎ-সঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গসঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী। ধন্য বীর!"

উপরের দুইটি উদ্ধৃতির মধ্যেই জগদীশচন্দ্রের যথার্থ পরিচয় আছে। লজ্জানত জননীর শিরে জয়মাল্য পরাইবার জন্য তাঁহার সাধনা; তিনি একান্তভাবে দেশগতপ্রাণ, দেশ-প্রেমিক এবং তিনি বীর। আজীবন তাঁহার সমস্ত সাধনার এবং সাধনালব্ধ কীর্ত্তিকলাপের মধ্যে তাঁহার দেশপ্রেম ও তাঁহার বীরত্ব জয়যুক্ত হইয়াছে। তিনি বারংবার ব্যাহত হইয়াছেন, অভাব-অনটনে পীড়িত হইয়াছেন, হীন বৈজ্ঞানিকের হীনতর স্বার্থবুদ্ধি তাঁহাকে পদে পদে বাধা দিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার দেশপ্রেমের ও বীরত্বের গতিরোধ করিতে পারে নাই।

জগদীশচন্দ্রের জীবনী তাঁহার 'অব্যক্তে'র মধ্যে তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন। সে জীবনী স্থান-কাল-পাত্রের অতীত; তাঁহার জন্ম, তাঁহার বংশ-পরিচয়, তাঁহার বাল্যশিক্ষা, তাঁহার সংস্কার—সব-কিছুকে অতিক্রম করিয়া অন্তরলোকের তীর্থযাত্রার ইতিহাস—'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে'র ইতিহাস। এই ইতিহাসে বিক্রমপুর রাঢ়ীখালের স্থান নাই, পিতা ভগবানচন্দ্রের স্থান নাই; পৃথিবীর সকল মনীষী ও মহাপুরুষের সঙ্গে এখানে তিনি সমগোত্রজ, এক পর্য্যায়ে বিরাজমান। তাঁহার ভাষাতেই শুনুন—

"সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। অন্ধকার

জগদীশ বসু সুদূর হইতে প্রেরিত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য
এক নূতন কল আবিষ্কারে ব্যস্ত
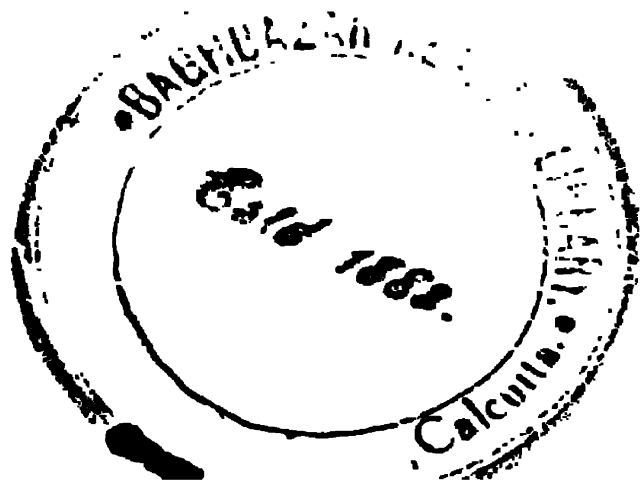
গাঢ়তর হইয়া আসিত। বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই কুল্ কুল্ ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম!......নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' নদী উত্তর করিত, 'মহাদেবের জটা হইতে।'

"একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্ম-পরিচিত, বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল—কোথায়, সে কোথা যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?

"তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, 'মহাদেবের পদতলে।'

"একদিন অতীব বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহ দ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথপ্রদর্শক বলিল, 'এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে—'

"এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

"আমার পথপ্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'সম্মুখে দেখ, জয় নন্দাদেবী! জয় ত্রিশূল!'

"উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখের আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্ত-প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই

নিবিড় নীল স্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষার-মূর্ত্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে—একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়। মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্ত্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণপূর্ব্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।”

জগতের সকল অব্যক্তের বক্তা ঋষিদের মত জগদীশচন্দ্রের জীবনেতিহাস। ভাগীরথীর চঞ্চল জলধারা কলোচ্ছ্বাসের ইঙ্গিতে একদা শৈশবে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, কত গ্রাম, কত জনপদ, কত শ্মশান, কত নিবিড় অরণ্য পার হইয়া উপলবন্ধুর পথে তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, তারপর ধীরে ধীরে দুর্গম পার্ব্বত্য পথে তাঁহার আরোহণ, ধীরে ধীরে জীবনের আবরণ-উন্মোচন। জড় জীবন হইয়া উঠিল, জীবন জড়তাপ্রাপ্ত হইল, উৎসের পর উৎসের সন্ধান—মহাদেবের জটানিঃসৃত কলনাদিনী গঙ্গার চকিত ইঙ্গিত আহ্বান—মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টি এবং সর্ব্বশেষে গিরিচূড়াগ্রভাগে পাতাল-গর্ভস্থিত মেদিনীবিদারক অভ্রচুম্বী মহাদেবের ত্রিশূল।

জগদীশচন্দ্র এই ত্রিশূল স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন; জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভক্তিতে এই ত্রিশূল ত্রিধা-বিভক্ত। তিনি বৈজ্ঞানিক রূপে, গুরু এবং ঋষিরূপে, কবিরূপে, এবং দেশমাতৃকার দীনতম সেবকরূপে জ্ঞানে কর্ম্মে ভক্তিতে আপনার সমগ্র জীবনকে একটি সুসমঞ্জস শতদলরূপে

বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং উত্তরজীবনে নিজের কথা ভাবিয়া তাই লিখিতে পারিয়াছিলেন—

"বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়ের অনুভূতি অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্ব্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য।"

কবি জগদীশচন্দ্র আত্মসম্বরণ করিয়া বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র হইয়াছিলেন ; অন্তরের এই দ্বন্দ্বে তিনি আজীবন পীড়িত হইয়াছেন— কবি এবং বৈজ্ঞানিক কেহই কারো কাছে পরাজয় স্বীকার করে নাই।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি জগদীশচন্দ্রের অসাধারণ প্রীতি ছিল। ভারতকে ভারতীয় করিবার স্বপ্ন তাঁহার মত আর কেহ দেখে নাই। এই কাজে তিনি ভগিনী নিবেদিতার উৎসাহ এবং সাহায্য বরাবর পাইয়াছিলেন এবং উভয়ে ভারতবর্ষের আত্মচেতনা উদ্বোধনের কাজকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্ষুদ্র ছাড়িয়া বৃহতের সন্ধানে, বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য আনয়নের চেষ্টাকে, জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন। এই সাধনা প্রাচীন ভারতবর্ষের এবং আজীবন তিনি এই ঐক্যের স্বপ্নই দেখিয়া গিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, "জ্ঞানের অন্বেষণে আকাশে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা বিশ্বের অগণিত জীব ব্রহ্মাণ্ডের কোটা সূর্য্যের মধ্যে সেই (ভারতবর্ষ) একতার সন্ধান করিয়াছে।"

তাঁহার আর একটি মহতী বাণী এই দুর্দ্দিনে বারংবার মনে

পড়িতেছে। এই আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত তিনি জীবনে অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই কখনও পরাজিত হন নাই, সেই বাণীটি আজ সকলেরই স্মরণীয়—

"বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল, সেই নীতি যেন বর্ত্তমান কালেও জীবন্ত ভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন যে, বারবার পরাজিত হইয়া যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।"

বীর জগদীশচন্দ্রও বিজয়ী হইয়াছিলেন এবং উপেক্ষিত, অবহেলিত মাতৃভূমিকে বিশ্বের বিজ্ঞান-দরবারে একটা স্থায়ী আসনও তিনিই দিয়া গিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের 'The Times' পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে যে সব কথা লিখিত হয়, তাহা পাঠ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি, একা জগদীশচন্দ্র কি অঘটন ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন!

'টাইম্‌স্' লিখিয়াছেন,—

Sir Jagadis Chandra Bose is a fine example of the fertile union between the immemorial mysticism of Indian philosophy and the experimental methods of western Science. Whilst we in Europe were still steeped in the rude empiricism of barbaric life, the subtle Eastern had swept the whole universe into a synthesis and had seen the one in all its changing manifestations.... He is pursuing science not only for itself but for its application to the benefit of mankind. We welcome the

additions to knowledge which he has made, but most of all we welcome in him the evidence that India and Great Britain can unite their genius to mutual advantage.

জড় ও চেতনের মত মৃত্যু ও জীবনের ভেদ ঘুচাইবার সন্ধান যদি তিনি জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে হয়তো একদিন জীবনের পরপার হইতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই অপূর্ব মিলন প্রত্যক্ষ করিবেন।

গত ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর, সোমবার বেলা ৮টা ১৫ মিনিটের সময় আচার্য জগদীশচন্দ্র গিরিডিতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে ঢাকা জেলার রাঢ়ীখাল গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭৯ হইয়াছিল।

জগদীশচন্দ্রের জীবন বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, দেশপ্রেম প্রভৃতি বহুদিকে বিকাশলাভ করিয়াছিল। আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, রমাঁ রল্যাঁ প্রভৃতি পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য মনীষীরা নানাভাবে তাঁহাকে নমস্কার নিবেদন করিয়াছেন এবং প্যাট্রিক গেডিডস্ প্রমুখ বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইংরেজী এবং বাংলাভাষায় তাঁহার বিস্তৃত জীবনী রচনা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই ইচ্ছা করিলে তাঁহার জীবনের সকল তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

জগদীশচন্দ্র প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বিজ্ঞানের একটি বিশেষ বিভাগে তাঁহার অক্লান্ত সাধনা ও সিদ্ধির জন্যই তাঁহার খ্যাতি। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মান করিয়াছিলেন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি তাঁহাকে

ফেলো নির্ব্বাচিত করিয়া বিজ্ঞান-জগতের শ্রেষ্ঠ গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

বসু-বিজ্ঞানমন্দির, ক্রেস্কোগ্রাফ, উদ্ভিদের প্রাণ ইত্যাদি বিষয়ে জগদীশচন্দ্রকে জড়াইয়া আমরা দূর হইতে তাঁহাকে একটা ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা বরাবরই দেখাইয়া আসিয়াছি ; কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালীর স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনও ধারণাই নাই। নিতান্ত কিংবদন্তীর জোরে বেতারের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক খাড়া করিয়া অনেককে দুঃখ করিতে শুনি যে, নেহাৎ পরাধীন দরিদ্র বাঙালী বলিয়াই তিনি তাঁহার বেতার-বিষয়ক আবিষ্কার চাপিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন, মাঝ হইতে মার্কনি সাহেব নাম করিয়া লইলেন। অনেকের ধারণা, এবিষয়ে তাঁহার আবিষ্কার তিনি জলের দরে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সত্য এবং মিথ্যা নানা আজগুবি খবর তাঁহার সম্বন্ধে আমরা শুনিয়া থাকি। তিনি বিজ্ঞানের ঠিক কোন্ বিভাগে গবেষণা করিয়াছেন, পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা সুরু করিয়া জীববিদ্যায় শেষ পর্য্যন্ত তিনি কেন আসিলেন, উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে তিনি নূতন কোনও তথ্য প্রচার করিয়াছেন কি না, বেতার সম্পর্কেই বা তাঁহার দান কি—এ সকল বিষয়ে আলোচনা বড় একটা দেখা যায় না। তিনি কবি, ঋষি এবং যাদুকর ছিলেন, উপনিষৎ হইতে শক্তি আহরণ করিয়া ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিকমহলে তাক লাগাইয়াছেন ; ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিকদের কাছে তাঁহার ফাঁকি চলিল না, তিনি ধরা পড়িয়া গিয়াছেন ইত্যাদি বহু পরস্পর-বিরোধী কথা—তাঁহার বিজ্ঞান-সাধনা

সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নাই বলিয়াই এদেশে প্রচার লাভ করিবার সুবিধা পাইতেছে। এই সকল 'উড়ো' ধারণা দূর করিবার জন্যই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্রের নিছক বিজ্ঞান-সাধনার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি। যেখানে স্বীকার করিবার, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা সেখানে তাঁহাকে নতমস্তকে স্বীকার করিয়াছেন ; তাঁহাদের উক্তি আমরা প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিব।

প্রসঙ্গতঃ তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষার কথা আসিয়া পড়ে ; বিজ্ঞানের কোন্ বিভাগে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিকের জীবন সুরু করিয়াছিলেন, তাহা জানিলে তাঁহার বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা সহজ হইবে।

জগদীশচন্দ্র কলিকাতার হেয়ারস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া, সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ হইতে এফ-এ ও বি-এ পাস করেন। পদার্থ-বিদ্যা তখন তাঁহার বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল। বি-এ পাস করিয়া তিনি লণ্ডন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং জুয়োলজী, বোটানী ও এনাটমীর পাঠ লইতে থাকেন।

মেডিকেল কলেজের পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি কেম্ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে প্রবেশ করিয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সেখান হইতে ন্যাচারাল সায়ান্স বিষয়ে উচ্চ সম্মান ও বৃত্তি (বি-এস-সি) লাভ করেন ; সঙ্গে সঙ্গে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস-সি উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বস্তুতঃ, এখানেই তাঁহার বিজ্ঞান-সাধনার সূত্রপাত।

ইহার অব্যবহিত পরেই ইয়োরোপে টেস্‌লা, হার্ট্‌জ ও রঞ্জন-রশ্মি (র‍্যণ্টগেন রে') বিষয়ক গবেষণার ফল প্রচারিত হয়। জগদীশচন্দ্র ভারতবর্ষে বসিয়াই ছাত্রদিগকে এক্সপেরিমেণ্ট-সহযোগে সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন যন্ত্রাদির অত্যন্ত অভাব ছিল, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের উদ্যম ও প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। সামান্য দ্রব্যাদির সাহায্যে বহুমূল্য যন্ত্রের অভাব দূর করিবার চেষ্টাতেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভাস্ফুরণ আরম্ভ হয়।

এই প্রাথমিক পরীক্ষার ফলস্বরূপ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের জার্ণালে তাঁহার বিদ্যুৎতরঙ্গ বিষয়ক প্রথম মৌলিক গবেষণা প্রচারিত হইয়া পাশ্চাত্য জগতে তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দেয়। পাশ্চাত্য বহু বৈজ্ঞানিক তাঁহার এই প্রবন্ধকে সূত্র করিয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মুখে লিভারপুল সহরে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ক তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত যন্ত্র প্রদর্শন করেন। এই যন্ত্র-সাহায্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের শক্তি ও গুণ নির্দ্ধারিত হয়। পরবর্ত্তী কালে যাবতীয় বেতার-সংবাদ প্রেরণে যে 'কোহিয়ারার' পদ্ধতি প্রচলিত হয়, এই যন্ত্র হইতেই তাহার প্রথম সূত্রপাত। এ সম্বন্ধে 'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা'র ত্রয়োদশ সংস্করণের (১৯২৬ খৃষ্টাব্দ) প্রথম ভল্যুমে ৪১ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল।

His first appearance before the British Association at Liverpool in 1895 was to demonstrate an apparatus for studying

the properties of electric waves almost identical with the coherers subsequently used in all systems of wireless communication. He also invented an instrument for verifying the laws of refraction, reflection and polarisation of electric waves.

লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা সমূহে এবং অন্যান্য বহু প্রসিদ্ধ পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সিলভ্যানাস পি. টমসন লিখিত এবং ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'Light Visible and Invisible' নামক গ্রন্থের ২২৬-২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

We are shortly to hear a discourse here by Professor G. Chunder Bose, of Calcutta, upon the polarisation of the electric wave as studied by him, with an exceedingly elegant apparatus producing still shorter waves.

১৮৯৯ খৃস্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড র‍্যালে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সমক্ষে জগদীশচন্দ্রের "On a self-recovering coherer and the study of the cohering action of different metals" নামক গবেষণার সংবাদ ঘোষণা করেন।

ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগতে 'কোহিয়ারার' থিওরী প্রচলিত ছিল। বেতার-তরঙ্গ ধরিবার জন্য তখন ধারকরূপে (রিসিভার) ধাতুচূর্ণ ব্যবহৃত হইত এবং বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করিতেন যে, বেতার-তরঙ্গ আকর্ষণ করিয়া এই ধাতু-চূর্ণগুলি সমষ্টিবদ্ধ হয় অর্থাৎ 'কোহিয়ার' করে। এই বিশ্বাসের দরুণ বেতার-টেলিগ্রাফির গবেষণা মাঝপথে রুদ্ধ হইয়াছিল—বৈজ্ঞানিকগণ অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন

না। জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করেন যে, আসলে ইহার বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। তাঁহার এই অভাবনীয় আবিষ্কার বর্তমানে বেতার-বার্তা প্রসারের প্রথম ও প্রধান কারণ। বাংলাদেশে যাঁহারা রেডিও সেট ব্যবহার করেন তাঁহারা সম্ভবতঃ কেহই অবগত নহেন যে, ক্রিস্টাল রিসিভার (গ্যালেনা রিসিভার) বাঙালী জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার।

বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎবহ (conductors) বস্তুর উপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রভাব বিষয়ে সে সময়ে বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে-ছিলেন। তন্মধ্যে অনেষ্টি, ব্রান্‌লি, ডসনটার্ণার, মিঙ্কিন ও লজের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ব্রান্‌লি প্রথম আবিষ্কার ও প্রচার করেন যে, বিদ্যুৎ স্পার্কের সন্নিকটস্থ বিভিন্ন ধাতুচূর্ণকে অধিকতর বিদ্যুৎবহ করিবার ক্ষমতা আছে—কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনি ইহার বিপরীত প্রভাবও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। লজ (সার অলিভার) বিশেষভাবে গবেষণা করিয়া লক্ষ্য করেন যে, দুইটি বিভিন্ন ধাতুর সংযোগস্থলের বৈদ্যুতিক বাধা (resistance) বিদ্যুৎ-তরঙ্গ স্পর্শে কমিয়া আসে—এই পদ্ধতিতে বাধা-হ্রাসের নাম তিনি দেন 'কোহিয়ারার' পদ্ধতি। একটি কাচের নলে লৌহ-চূর্ণ পূরিয়া সেটিকেই তিনি রিসিভাররূপে ব্যবহার করেন। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চালনা করিয়া দেখা যায়, বাধা (resistance) কমিয়া গিয়াছে; নলটি নাড়িয়া দিয়া তিনি আবার বাধা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এই পরীক্ষা প্রদর্শন করেন এবং প্রচার করেন যে, ধাতুচূর্ণগুলি পরস্পর 'কোহিয়ার' করিয়া অর্থাৎ সংলগ্ন হইয়া বাধা অপসারণ করে। লেড পেরোক্সাইড লইয়া পরীক্ষা করিয়া ব্র্যান্‌লি দেখান যে, 'কোহিয়ারার'

পদ্ধতি সর্বত্র খাটে না। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আচার্য জগদীশচন্দ্র সর্বপ্রথমে এই সকল খামখেয়ালি রিসিভারকে একটি প্রণালীর মধ্যে আনিয়া ফেলিতে সক্ষম হন; ধাতুচূর্ণের পরিবর্তে তিনি স্পাইরাল স্প্রিং ব্যবহারের নির্দেশ দেন। এবিষয়ে 'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা'র একাদশ সংস্করণের (১৯১০-১১ খৃঃ) নবম ভল্যুমের ২০৬ পৃষ্ঠায় স্যার জে, জে, টমসন লিখিয়াছেন—

To get greater regularity Bose uses, instead of the iron turnings, spiral springs, which are pushed against each other by means of a screw until the most sensitive state is attained.

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জি. মার্কনি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়া গবেষণা শুরু করেন এবং জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের সাহায্য লইয়া কোহিয়ারের সংস্কার করিয়া বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধারক যন্ত্রের এতদূর উন্নতি করিতে সক্ষম হন যে, থিওরি শুধু বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় অথবা বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিগত গবেষণাগারে বদ্ধ থাকে না; ব্যবহারিক জগতে বেতার-টেলিগ্রাফ এবং পরবর্তী সংস্কার রেডিওরূপে তাহা মানুষের অন্তহীন উপকার সাধন করে। এই সাধনার ফল আমরা বর্তমানে সকলেই ভোগ করিতেছি; কিন্তু আমাদের স্মরণ করিতে ভুল হয় যে, এই উন্নতির মূলে একজন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের সাধনা লুক্কায়িত আছে। এবিষয়ে সামান্য প্রমাণ-পঞ্জী উপস্থিত করিতেছি।

১৯৩০ সালের ১১ই জানুয়ারীর "নেচার" পত্রিকার ৫৯ পৃষ্ঠায়

সার হেনরি জ্যাকসন, এফ-আর-এস (অ্যাডমিরাল অব দি ফ্লীট, গ্রেটব্রিটেন এণ্ড আয়ারল্যাণ্ড) প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছে—

In 1891 the navy was seeking some means by which a torpedo-boat could announce her approach to a friendly ship, and the idea first came to Sir Henry Jackson of employing Hertzion waves as a means of communication for this purpose. He was then at sea and was unable to put his ideas into a practical form until in 1895, when in command of the *Defiance* he read of some experiments by Dr. (now Sir) Jagadish Bose on Coherers. Having obtained a satisfactory coherer he managed in this year to effect communication by electric-magnetic radiation from one end of his ship to the other. During the next two years he continued his experiment with increasing success. On September 1, 1896, he (Sir Henry) first met Mr. Marconi......

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় জগদীশচন্দ্র ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন সম্পর্কে যে বক্তৃতা দেন, সে বিষয়ে বলিতে গিয়া বিখ্যাত 'ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার' পত্রিকা লেখেন—

That no secret was at any time made as to its (Bose's Receiver) construction, so that it has been open to all the world to adopt it for practical and possibly money-making purposes—

জগদীশচন্দ্রের পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধাবলী সার জে, জে, টমসনের সম্পাদনায় (Collected Physical Papers) [Longmans Green & Co., 1926. 10s.] প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় সার জে, জে, টমসন লিখিয়াছেন—"বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ে হার্টজের পরীক্ষার ফল প্রচারিত হইবার পর বিদ্যুৎ-তরঙ্গের শক্তি ও গুণবিষয়ক গবেষণা প্রবল ভাবে আরম্ভ হয়। বোস কর্তৃক হ্রস্বতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য-সম্বলিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার ফলে গবেষকদের সুবিধা

হইয়াছে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তিনি স্বয়ং কোহিয়ারেন্স, পোলারিজেশন, ডবল রিফ্রাকশন ও পোলারিজেশনের ক্ষেত্রের রোটেশন সম্পর্কে কার্যকর ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

'কোহিয়ারার' সম্বন্ধীয় গবেষণায় অগ্রসর হইতে হইতে জগদীশচন্দ্র অনুভব করেন যে, চেতন বস্তুর মত জড়েরও অবসাদ আসে। সেই হইতে জড় ও জীবিতের ঐক্য সন্ধানে তিনি আত্মনিয়োগ করেন এবং পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা ছাড়িয়া তিনি উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-বিজ্ঞান লইয়া কাজ করিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৫ সালের জুন মাসে এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার এই পথ-পরিবর্ত্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মিলিবে।

"সকলেই মনে করেন যে জড়, উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর বর্ত্তমান। তবে দৃষ্ট জগৎ কি কোন নিয়মে আবদ্ধ নহে? এরূপও হইতে পারে যে, আপাততঃ বৈষম্যের মধ্যে কোন মূলগত একত্বের বন্ধন আছে।

"আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এই সমস্যা আমার মন অধিকার করিয়াছিল। আমি তখন আকাশের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছিলাম, এবং দূর হইতে প্রেরিত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এক নূতন কল আবিষ্কার ও নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। দেখিতে পাইলাম, ধাতু-নির্ম্মিত কলের লিপি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল, যেন কলটি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। লিপির ধরণ আমাদের ক্লান্তি-লিপিরই অনুরূপ। মানুষের যেমন বিশ্রামের পর ক্লান্তি দূর হয়, কলটিরও সেইরূপ বিশ্রামের পর ক্লান্তি দূর হইল।

আবার কতকগুলি ঔষধে যেমন আমাদিগকে উত্তেজিত করে, জড়-নির্ম্মিত কলেও তাহার অনুরূপ প্রক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। উহার ফলে বহুদূর হইতে প্রেরিত অতি ক্ষীণ সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অপিচ কতকগুলি দ্রব্য কলের উপর বিষবৎ কার্য্য করিয়াছিল, যাহার জন্য কলের সাড়া দিবার শক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইল। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, অনেক সময় যেমন অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করিলে জীবদেহে উত্তেজকের ক্রিয়া করে, ধাতু-নির্ম্মিত যন্ত্রেও সেইরূপ ফল দৃষ্ট হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার আভাষ দেখিতে পাইলাম। ইহা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, জড় ও জীব-জগৎ একই নিয়মে পরিচালিত এবং উহারা একই সূত্রে গ্রথিত।"

ফিজিক্স হইতে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান তথা ফিজিওলজিতে এই ভাবেই তাঁহার যাত্রা! এখানে বলা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমানের টকি ফিল্মের আবিষ্কারের সঙ্গেও জগদীশচন্দ্রের পরোক্ষ যোগ আছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে 'কোহিয়ারার' বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার মনে হয়—

It would be interesting to investigate whether the observed action of electric radiation on a potassium receiver is in any way analogous to the photo-electric action of visible light.

এই কথাকে সূত্র ধরিয়া বিভিন্ন ধাতুর ফটো-ইলেক্‌ট্রিক অ্যাকশন সম্বন্ধে গবেষণা করিতে করিতে টকি ফিল্মের উদ্ভব হইয়াছে।

জড়জগৎ ও জীব-জগতের ঐক্য অনুসন্ধানের ফল তিনি ১৯০১ সালের ১০ই মে তারিখে রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউসন অব গ্রেটব্রিটেনের সমক্ষে জ্ঞাপন করেন—It was when I came upon the mute witness of

these self-made records and perceived in them one phase of a pervading unity that bears within it all things—mote that quivers in ripples of light, the teeming life upon one earth, and the radiant suns that shine above us, it was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago— "They who see but One in all changing manifoldness of this universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else"

১৯০২ খৃষ্টাব্দে Linnean সোসাইটির জার্নালে তাহার 'Electric Response in ordinary plants under mechanical stimulation' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার বৈজ্ঞানিক জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হয়। ঐ সালেই তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তক 'জীবিত ও জড়ের স্পন্দন' (Response in the Living and Non-living—Longmans) ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পদার্থ-বিজ্ঞান অপেক্ষা প্রাণি-বিজ্ঞানের আকর্ষণ অধিক হয়, বহুর মধ্যে একের অনুসন্ধান আরম্ভ হয়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে তাঁহার বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বসিয়াই তিনি দীর্ঘদিনের তপস্যার ফলে উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীর জীবন-রহস্য অনেকখানি উদ্ঘাটিত করিতে সক্ষম হন এবং গুরু আচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার শিষ্যদের গড়িয়া তুলিবার কাজে ও তাহাদিগকে বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে প্রবেশে সহায়তা করেন। ১৯০২ হইতে তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান বিষয়ে ১৭ খানি বিখ্যাত গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন। জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান ভাষায় ইহাদের মধ্যে

কয়েকটির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহার বহু আবিষ্কারের মধ্যে নিম্ন-লিখিতগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। রেজোনেণ্ট রেকর্ডার ২। ক্রেস্কোগ্রাফ ৩। ইলেক্‌ট্রিক প্রোব

তিনি এই সময়ে কয়েকবার পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করিয়া বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভায় তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। দুই-একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রথমতঃ তাঁহার আবিষ্কারে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে জগদীশচন্দ্রকে মানিতে হইয়াছিল। উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-বিজ্ঞান সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার এবং এই সকল বিচার-বিতর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নহে। যাঁহারা এসম্বন্ধে জানিতে চান, তাঁহাদিগকে অধ্যাপক প্যাট্রিক গেড্‌ডিস্ লিখিত তাঁহার জীবনী (An Indian Pioneer in Science, The life and work of Sir Jagadis C. Bose M.A., D. Sc., Ll. D., F. R. S., C. I. E., C. S. I.) [Longmans Green & Co., 1920] পড়িয়া দেখিতে বলি, এবং সেই সঙ্গে স্মরণ রাখিতে বলি—বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনষ্টাইনের কথা—যিনি জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে বলিয়াছেন—

"জগদীশচন্দ্র যে সকল অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়াছেন, তাহার যে কোনটির জন্য তাঁহার নামে বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।"

—শেষ